বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষীদের কথা

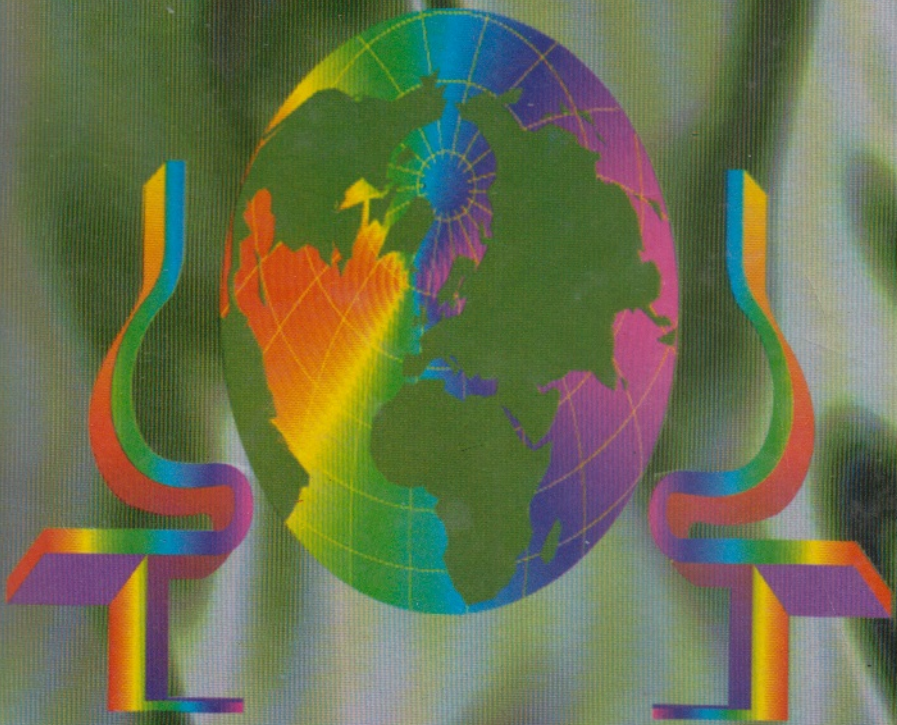

মোহাম্মদ সোহেল

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষীদের কথা

মোহাম্মদ সোহেল

এম এস পাবলিকেশন্স
২/৩, প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুসলিম মণীষীদের কথা

সম্পাদনায় ঃ

অধ্যাপক মাওঃ মোঃ গোলাম মোস্তফা সিদ্দিকী

এম, এম, (ডবল) বি. এ, (অনার্স) এম, এ

বহু গ্রন্থ প্রণেতা, নিবন্ধকার ।

প্রকাশক ঃ

মোহাম্মদ সোহেল

এম এস পাবলিকেশন্স

২/৩, প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০ ।

এম এস পি-৬

প্রথম প্রকাশ ঃ

মে ১৯৯৮ ইংরেজী

(গ্রন্থকার কর্তৃক সবস্বত সংরক্ষিত)

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ

দি প্রাইম কম্পিউটার, ঢাকা

হাদীয়া ঃ ৬০.০০ টাকা মাত্র ।

BISHER SRESTO MUSLIM MANISHIDER KATHA

Written By : Mohammad Sohel

Published by : M. S. Publications

2/3, Paridas Road. Dhaka-1100

1st Eddition : May 98. Prise : Tk. 60., U S $ 3.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ফারহানা ইসলাম

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) / ৫

মওলানা জালালুদ্দীন রুমী / ২০

ইবনে খালদুন / ২৪

ইমাম বোখারী (রঃ) / ২৮

ইমাম আবু হানিফা / ৩৭

আমির খসরু / ৪৪

হযরত শাহ্‌জালাল ইয়ামেনী (রঃ) / ৪৭

ইমাম গাজালী (রঃ) / ৫২

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) / ৫৬

হযরত শাহ পরান (রঃ) / ৬১

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) / ৬৫

কবি গোলাম মোস্তফা / ৭৩

হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া / ৭৬

মুহাম্মদ বিন কাসিম / ৮০

আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল / ৮৩

কাজী নজরুল ইসলাম / ৮৭

আল্লামা শেখ সাদী (রঃ) / ৯২

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ / ৯৯

আল-বেরুনী / ১০৫

সম্রাট শাহজাহান / ১০৮

www.pathagar.com

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

ভূমিকা ঃ সমগ্র বিশ্বজগত যখন পাপ পংকিলতা, অন্যায় অত্যাচার ও অজ্ঞানতার অমানিশায় নিমজ্জিত হয়েছিল, বিশ্ববাসী যখন তীর্থের কাকের মত দাঁড়িয়ে শান্তি ও মুক্তির অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ ছিল আইয়্যামে জাহেলিয়ার এ সংকটময় পরিস্থিতে শান্তির কান্ডারী মুক্তির দিশারী সাইয়্যেদুল মুরসালীন রহমাতুললিল আলামীন খাতামুল আম্বিয়া সরওয়ারে কায়েনাত শাফীউল মুজানবীন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এ দুনিয়াতে আগমন করেন। তাঁর আগমনে আকাশ বাতাস সহ সমগ্র নভমন্ডল ভূমন্ডল মুখরিত হয়েছিল। আনন্দের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। সর্বকালের সর্বযুগের এই শ্রেষ্ঠ মহামানব ২৩টি বছর অক্লান্ত সাধনার বিনিময়ে বিশ্ববাসীকে এক সুন্দর শান্তিময় পরিপূর্ণ জীবনবিধান উপহার দিয়ে ৬৩ বছর বয়সে আবার লাখ মানুষের হৃদয়কে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে পরকালের পথে যাত্রা করেন। সেই মহামানবকে সৃষ্টি না করা হলে আকাশ বাতাস গাছপালা পাহাড় পর্বত, নদীনালা, মানব দানব, পশুপাখী কিছুই সৃষ্টি করা হতো না। যাকে নবী হিসাবে না পাঠালে আজ আমরা শান্তি, মুক্তি পেতাম না, সত্য চিনতাম না। সে প্রিয় মানুষই হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)। আমাদের সুখ শান্তি ও মুক্তির জন্য যিনি শত কষ্ট স্বীকার করে গেছেন তাঁকে

www.pathagar.com

আজ আমরা না দেখতে পেলেও তাঁর উম্মত হতে পেরে জীবন ধন্য হয়েছে। আসুন আমরা সকলে এই মহা মানবের জীবনবৃত্তান্ত জেনে নিয়ে তাঁর মহান আদর্শগুলো গ্রহণ করে নিজেদেরকে সৌভাগ্যের পরশ পাথর হিসাবে গড়ি।

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিন মক্কার বিখ্যাত কোরাইশ বংশের অন্যতম প্রধান শাখা হাশেমী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) -এর পিতা আবদুল্লাহ ২০ বছর বয়সে কোরাইশ বংশের ধনী যোহরা গোত্রের ওহাব তনয়া পুণ্যময়ী রাসূলের শ্রদ্ধেয় আম্মা আমিনাকে বিবাহ করেছিলেন। রাসূল (সঃ) মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় দিক হতেই হযরত ইব্রাহীম এবং ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। নবী করীম (সঃ) এর ঊর্ধ্বতন একাদশ পূর্বপুরুষের নাম ছিল ফিহির। তিনি কোরাইশ নামেও পরিচিত ছিলেন। এ কারণেই রাসূলের বংশধারা কোরাইশ নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রিয় নবী (সঃ) ইয়াতীম হয়ে এ দুনিয়াতে আগমন করেন। তিনি মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময় তাঁর পিতা আবদুল্লাহ সিরিয়া থেকে ব্যবসা করে ফিরার পথে মদীনায় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

নামকরণ ও দুধপান ঃ জন্মের পরে রাসূলে পাক (সঃ)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব রাসূলের নাম রাখেন মুহাম্মদ এবং রাসূলের মাতা আমিনা তাঁর নাম রাখেন আহম্মদ, মুহামদ শব্দের অর্থ চরম

www.pathagar.com

প্রশংসিত এবং আহমদ শব্দের অর্থ চরম প্রশংসাকারী, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে রাসূলের এই দুটি নামের ভবিষ্যবাণী করা হয়েছে।

জন্মের পরে নবী করীম (সঃ) কয়েকদিন মাতা আমিনার দুধ পান করেন। এর পরে সুওয়াইবা নামে আবু লাহাবের এক দাসী তাঁকে দুধ পান করান। এর পর তৎকালীন আরবের প্রথানুযায় বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় পারদর্শী বনু সাদ গোত্রের হালিমার কোলে তুলে দেয়া হয়।

শৈশব কাল

হালিমার গৃহে ঃ হালিমা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার পরে এক বিরাট পরিবর্তন দেখতে পেলেন। তাহলো হালিমার গৃহপালিত মেষগুলো অধিক পরিপুষ্ট হতে লাগলো এবং অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দান করতে থাকলো। তাছাড়া হালিমার গৃহের সকল অভাব অনটন দূর হয়ে গেল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, রাসূল সব সময় মাতা হালিমার একটি স্তন থেকে দুধ পান করতেন এবং বাকী স্তনটির দুধ তাঁর ভাই হালিমার নিজ পুত্র আবদুল্লাহ-এর জন্যে রেখে দিতেন। দুই বছর বয়স পরে দুধ খাওয়ানোর কাজ শেষ হলে পরে হালিমা নবীকে আমিনার কোলে ফিরিয়ে দিতে নিয়ে গেলেন, কিন্তু সে সময় মক্কায় প্লেগ, মহামারী প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ার কারণে রাসূলের মাতা আমিনা হালিমাকে আরো কিছুদিন লালন পালন করার জন্যে বললেন, হালিমা পুনরায় শিশু মুহাম্মদ (সঃ)-কে গৃহে নিয়ে আসেন। এর-পরে আরো ৩টি বছর রাসূল হালিমার গৃহে অবস্থান করেছিলেন। হালিমার গৃহে থাকাকালে রাসূল তার দুধ ভাই

www.pathagar.com

আবদুল্লাহর সাথে মেষ চরিয়ে তাকে সহায়তা করতেন। শিক্ষার উপযুক্ত সময় রাসূলের শৈশবকালে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তবে তিনি হালিমার গৃহে থাকাকালীন ৫ বছর সময়ের মধ্যে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলায় পারদর্শী হয়েছিলেন।

আমিনার কোলে ঃ পাঁচ বছর পরে দুধমাতা হালিমা শিশু মুহাম্মদ (সঃ)-কে মাতা আমিনার কোলে ফিরিয়ে দিয়ে যান। ছয় বছর বয়সে পিতার কবর যেয়ারত উপলক্ষে মাতা আমিনার সাথে মদীনায় যান, মদীনা হতে ফিরার পথে 'আবওয়া' নামক স্থানে মা আমিনা মৃত্যু বরণ করেন। দাসী উম্মে আয়মান ছয় বছরের শিশু মুহাম্মদ (সঃ)-কে বাড়ীতে নিয়ে আসেন।

আবদুল মুত্তালিবের কোলে ঃ মাতা আমিনাকে হারিয়ে শিশু মুহাম্মদ (সঃ) একান্ত অসহায় হয়ে পড়েন তখন তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর লালন পালন ও দেখা শুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু দাদার কোলেও বেশী দিন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারলেন না। দুই বছর দুই মাস দশ দিন দাদার কোলে থাকার পরে দাদাও শিশু মুহাম্মদ (সঃ) কে রেখে এ দুনিয়া হতে চির বিদায় নিয়ে গেলেন। তখন মোহাম্মদ (সঃ) এর বয়স হয়েছিল আট বছর।

আবু তালিবের গৃহে ঃ আট বছর বয়সে দাদাকে হারানোর পরে মুহাম্মদ (সঃ)-এর লালন পালনের দায়িত্ব অর্পিত হয় চাচা আবু তালিবের উপর। চাচা আবু তালিব মুহাম্মদ (সঃ)-কে অত্যন্ত আদর যত্ন করতেন। তবে তাঁর আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভাল না থাকার

www.pathagar.com

কারণে তাঁর গৃহে নবীকে খুব কষ্ট করতে হয়েছে পার্শ্ববর্তী উপত্যকায় তাঁকে মেষ চরাতে হয়েছে। এভাবে সুখে দুঃখে আনন্দ বেদনায় আবু তালিবের গৃহে শৈশব জীবন অতিবাহিত করে কৈশোর জীবনে পদার্পণ করেন।

কৈশোর জীবন

সিরিয়া যাত্রা ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) চাচা আবু তালিবের গৃহে লালিত পালিত হয়ে বয়স যখন বার বছর দুই মাস, তখন তিনি চাচার সাথে সিরিয়া যাবার জন্যে বায়না ধরলেন আর চাচাও আদরের ভাতিজা মুহাম্মদ (সঃ)-কে তাঁর সাথে সিরিয়া নিয়ে গেলেন। সিরিয়া যাবার পরে রাসূল অনেক অজানা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। সিরিয়া যাত্রার পথে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনা তাহলো যখন তাঁরা "তাইমা" নামক স্থানে তাঁবু করলেন। তখন বুহাইরা নামে এক খৃষ্টান পাদ্রী বালক মোহাম্মদকে আখেরী নবী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং আবু তালিবকে বালক মুহাম্মদ (সঃ)- কে কাফের মোশরেকদের থেকে দূরে রাখার জন্যে উপদেশ দেন। কারণ তারা বালক মুহাম্মদকে পেলে মেরে ফেলবে।

যোজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বয়স যখন পনর বছর তখন মক্কার প্রসিদ্ধ "ওকায" মেলা হতে একটি কলহের সৃষ্টি হয়ে তা যুদ্ধের আকার ধারণ করে। আস্তে আস্তে আরবের সকল গোত্র এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। পাঁচ বছর যাবত এ যুদ্ধ লছিল। এ যুদ্ধকে হরবে যোজার বলে। রাসূলে পাকের বংশধর শেমী গোত্রও এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে মুহাম্মদ (সঃ)-কে ও

www.pathagar.com

পিতৃব্য আবু তালিবের সাথে এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়। তিনি নিজে যুদ্ধ করেননি, তবে তাঁর চাচা আবু তালিবকে যুদ্ধের তীর কুড়িয়ে দিতেন মাত্র।

যৌবনকাল

হিলফুল ফুযুল গঠন ঃ রাসূলের বয়স যখন ষোল কিংবা সতর বছর তখন তিনি হিলফুল ফুযুল নামে একটি সেবা সংঘ গড়ে তোলেন। ধনী দরিদ্র সুখী দুঃখী সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশে এ সংঘ গঠন করে তিনি সমাজে এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

আলআমীন উপাধি ও ব্যবসায় সুনাম অর্জন ঃ যুবক হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বদা গরীব দুঃখী লোকের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনতেন এবং তাদেরকে যথা সাধ্য সাহায্য সহযোগিতা করতেন। সকলের সাথে কোমল মিষ্টি ভাষায় কথা বলতেন। কারো সাথে কোনরূপ ঝগড়া ফাসাদে জড়াতেন না; বরং তিনি তা মীমাংসা করে দিতেন। এভাবে তাঁর সদাচরণ, ন্যায়পারয়ণতা, ওয়াদা পালন ও সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ সমাজের সকলের নিকট পৌছে যায়। ফলে সমাজের লোকেরা তাঁর কাছে বিভিন্ন জিনিস আমানত রাখা শুরু করে এবং তাঁকে মুহাম্মদ না বলে আল-আমীন বলে ডাকতে শুরু করে। আল আমীন অর্থ বিশ্বাসী।

www.pathagar.com

তাছাড়া নবী করীম (সঃ) যতবারই ব্যবসা করতে গিয়েছেন তত বারই প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে নবীর এ সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে আরবের তৎকালীন ধনাঢ্য রমণী হযরত খাদীজা তাঁর ব্যবসার দায়িত্ব নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর অর্পণ করেন। খাদীজা নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর ব্যবসার ভার দেয়ার পর থেকে তাঁর ব্যবসায় উত্তরোত্তর উন্নতি হতে থাকে।

খাদীজার সাথে বিবাহ ঃ হযরত খাদীজা (রঃ) রাসূল পাকের আচার আচরণ, ব্যবহার, চলাফেরা কাজকর্ম দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে নাফীসা নামের এক সহচরীর মাধ্যমে রাসূলের নিকট তাঁর বিবাহের প্রস্তাব দেন। রাসূল এ প্রস্তাবে মনে মনে খুশী হলেও চাচা আবু তালিবের অনুমতি আনার জন্যে বলেন। এরপর আবু তালিবের অনুমতি সাপেক্ষে নবী করীম (সঃ) পঁচিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছর বয়স্কা আরবের ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত খুওয়াইলোদ তনয়া বিবি খাদিজা (রাঃ)-কে ৪০০ দিরহাম মহর ধার্য করে বিবাহ করেন। খাদীজা (রাঃ) যতদিন জীবিত ছিলেন রাসূল ততদিন পর্যন্ত অন্য কোন বিবাহ করেননি। তবে তাঁর মৃত্যুর পর হযরত আয়েশাসহ আরো দশ জন নারীকে বিবাহ করেন।

নবুয়তপ্রাপ্তি ঃ রাসূল পাক (সঃ) বিবি খাদীজাকে বিবাহ করার পর থেকে তাঁর সকল প্রকার অভাব অনটন দূর হয়ে যায় এবং তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাসূলের বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর তখন তাঁর এই ধ্যানমগ্নতা আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে তিনি মক্কার অনতিদূরে হেরা গুহায় দিনের পর দিন নির্জনে ধ্যান মগ্ন থেকে সৃষ্টি রহস্য মানুষের মুক্তির পথ সম্পর্কে চিন্তা

www.pathagar.com

ভাবনা করতে থাকেন। এমনি করে রাসূল (সঃ) যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হন তখন পবিত্র রমযান মাসের সাতাইশ তারিখে তাঁর উপর পবিত্র কোরআনের "সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। যার প্রথম আয়াতটির অর্থ হলো "পড় তোমার প্রভুর নামে।"

নুবয়ত প্রাপ্তির পর প্রথম তিন বছর ঃ রাসূল (সঃ) নবুয়তপ্রাপ্ত হওয়ার পরে গোপনে গোপনে ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন। প্রথমেই তাঁর ডাকে যিনি সাড়া দিয়েছিলেন তিনি হলেন উম্মাহাতুল মোমেনীন হযরত খাদীজা (রাঃ)। বয়স্কদের মধ্যে প্রথম হযরত আবু বকর আর বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) গোলামদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত যায়দ ইবনে হারেসা (রাঃ)। প্রথম তিন বছর তিনি গোপনে ইসলাম প্রচার করেন এবং আল্লাহর হুকুম আহকামগুলো অতি গোপনে গোপনে পালন করতেন। তিন বছর গোপন দাওয়াতের পর আল্লাহর পক্ষ হতে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ আসলো।

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার ঃ মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশে রাসূল (সঃ) যখন নবুয়তের চতুর্থ বছর প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন ঠিক মক্কার কাফেররা তাঁর উপর নির্যাতন নিষ্পেষণ অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ করে। প্রকাশ্যে প্রথম যখন সাফা পাহাড়ের গাদদেশে রাসূল সকলকে ডেকে ইসলামের দাওয়াত দেন তখন আবু লাহাব তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপ করে আহত করে। এমনিভাবে রাসূলকে এক পর্যায়ে মিথ্যাবাদী পাগল বলেও আখ্যায়িত করা হয়। মোট কথা নির্যাতনের কোন দিকই বাকী রাখা হলো না।

www.pathagar.com

রাসূলের উপর নির্যাতন করে যখন দমাতে পারলো না, মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন দুর্বল মুসলমানদের উপর চালানো হলো অমানুষিক অত্যাচার। ফলে নবুয়্যাতের পঞ্চম বছর রজব মাসে বার জন সাহাবী এবং চার জন সাহাবিয়া মোট ষোল জন মুসলমান আবিসিনিয়া হিজরত করেন। সেখানে বাদশাহ নাজাশী কর্তৃক মুসলমানরা আশ্রয় খুঁজে পায়। ফলে দ্বিতীয় বার জাফর ইবনে আবু তালিবের নেতৃত্বে তেরাশি জন পুরুষ ও বার জন মহিলা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছর হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত হামযা (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধিপায় অন্য দিকে কাফের মোশরেকরা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে ভেবে মুসলমানদের উপর সীমা ছাড়িয়ে অত্যাচার শুরু করে। এমন কি কোরাইশরা রাসুল (সঃ)-এর সাথে সর্বাত্মক বয়কট ঘোষণা করে। ফলে নবী কারীম (সঃ) তাঁর শিষ্যকে নিয়ে "শি'বে- আবু তালিব' নামক নির্জন পার্বত্য উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছু দিন পরেই এই উপত্যকায় খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ফলে সেখানে অবস্থানরত মুসলমানদের দুঃখ কষ্টের সীমা থাকেনি। এমনকি ক্ষুধার জ্বালায় শুষ্ক চর্ম ও গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়েছে।

নবুয়তের দশম বছরটি ছিল রাসুলের জীবনের এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। কারণ এই বছরই রাসূল (সঃ)-এর সুখ দুঃখের সাথী জীবনসঙ্গি প্রাণ প্রিয় সহধর্মিনীখাদিজা (রাঃ)-এর পিতৃব্য আবু তালিব এই বছর মারা যান। ফলে রাসূল মানসিকভাবে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে।

যতদিন আবু তালিব জীবিত ছিলেন ততদিন কোরাইশরা নবী করীম (সঃ)-এর উপর প্রত্যক্ষভাবে কোন নির্যাতন চালাতে সাহস

www.pathagar.com

পায় নাই। কিন্তু আবু তলিবের মৃত্যুর পরে তারা এ সাহস পায় এবং রাসূলের উপর বিভিন্ন উপায়ে নির্যাতন চালাতে শুরু করে। ফলে রাসূল (সঃ) অসহায় হয়ে নবুয়তের দশম বছর শাওয়াল মাসের শেষের দিকে যায়েদ ইবনে হারেসাকে নিয়ে তায়েফে যান এবং দীর্ঘ এক মাস যাবত তায়েফে ইসলাম প্রচার করেন, কিন্তু কেউই নবীর ডাকে সাড়া দেয়নি। তাঁর প্রতি পাথর মেরে রক্তাক্ত ও বেহুশ করে তায়েফ থেকে তাড়িয়ে দেয়।

তায়েফ হতে ফিরে আসার পরে রমযান মাসে নবী করীম (সঃ) হযরত সওদা এবং হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। নবুয়তের একাদশ বছর রজব মাসের সাতাশে তারিখে নবী করীম (সঃ) সশরীরে মেরাজে গমন করে সপ্ত আসমান, বেহেশত দোযখ ভ্রমণ করেন আর মহান আল্লাহর দীদার লাভ করেন এবং আমাদের জন্যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আনেন।

মদীনায় হিজরত : মেরাজ থেকে আসার পরে মক্কার কাফের মোশরেকরা রাসূলের উপর আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তারা যখন দেখলো তা কোন উপায়ই মুহাম্মদ (সঃ)-কে ঠেকানো যায় না তখন তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। আল্লাহর নির্দেশে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে হযরত আবু বকরকে নিয়ে রাতের আঁধারে মদীনার পথে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে সওর গুহায় তিন দিন আত্মগোপন করে থাকেন। সওর গুহায় প্রবেশের পর ওখানে শত্রুপক্ষ যাতে তাঁদের পদচিহ্ন বা কোন সন্ধান না পায় এই জন্যে আল্লাহ তাআলা ঐ গুহার মুখ কবুতরের বাসা ও মাকড়সার জাল দিয়ে ঢেকে রাখেন। ফলে শত্রুরা গুহার মুখে গিয়েও তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারেনি। তিন দিন পরে গুহা থেকে বের হয়ে তাঁরা মদীনার পথে যাত্রা করেন।

www.pathagar.com

ওদিকে মদীনাবাসীরা রাসূলের আগমনের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছিল। নবীকে পেয়ে ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত গেয়ে উঠলো তলাআল বাদরু আলাইনা মিন সাত্রিয়াতিল বিদায়ি ওয়াজবাশ শুকরু আলাইনা মাদিআ লিল্লাহি দায়ী"।

রাসূলের মাদানী জীবন ঃ হিজরতের প্রথম পর্যায়ে মদীনার উপকণ্ঠে অবস্তিত কোবা পল্লীতে চৌদ্দ দিন অবস্থানের পরে রাসূল (সঃ) মদীনায় যান। মদীনায় যাওয়ার পরে রাসূলের কাসওয়া নামক উটটি যেখানে বসে পড়ল সেখানে নামাযের জন্যে মসজিদ তৈরী করার জন্যে সিদ্ধান্ত নেয়া হল। কারণ ইতিপূর্বে মদীনাতে নামাযের জন্যে কোন মসজিদ নির্মিত হয়নি। এর পরে সেই জায়গাটি ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণ করা হলো এবং মসজিদের পাশেই নবীজীর জন্যে একখানা বাসস্থান তৈরী করা হলো। এই মসজিদই মসজিদে নববী।

মদীনা যাওয়ার পর নবী করীম (সঃ) আস্তে আস্তে ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্যে বিভিন্ন কাজের উপর জোর দেন। মক্কা থেকে যেসকল সাহাবী হিজরত করেছিলেন তাঁরা ইতিহাসে মুহাজির নামে খ্যাত এবং মদীনার যে সকল সাহাবী এ মুহাজিরদের আশ্রয় দেন তাঁরা হলেন আনসার। নবী করীম (সঃ) এই দুই দলের মধ্যে বিভিন্ন রকম সম্পর্ক স্থাপনসহ সাধারণভাবে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন ।

মদীনাকে তিনি একটি সুন্দর শান্তিকামী ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করে। রাষ্ট্রনায়ক হলেন স্বয়ং রাসূল (সঃ) তিনি মদীনাতে গিয়ে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের স্বার্থ, অধিকার ও শান্তি নিশ্চিত করতে সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিক মদীনা সনদ রচনা করেন। মুসলমানরা যখন এভাবে বিভিন্ন দিক হতে শক্তিশালী হতে

www.pathagar.com

শুরু করলো তখন আল্লাহ তাআলা কাফেরদের প্রতিরোধ যুদ্ধ করার অনুমতি দান করেন।

মদীনায় হিজরতের পর প্রথম বছর দুটি অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। দ্বিতীয় হিজরীতে পাঁচটি যুদ্ধ হয় এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হয়েছিল ১২ই রমযান মতান্তরে ১৭ই রমযান ঐতিহাসিক বদর প্রান্তে। এ যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন মুসলমান ১০০০ হাজার অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত কোরাইশ বাহিনীর মোকাবেলায় বিজয় লাভ করে। এ যুদ্ধে কাফেরদের ৭০ জন মারা যায় এবং ৭০ জন বন্দী হয় এবং সাহাবীদের মধ্যে ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনসার শাহাদত বরণ করেন।

হিজরী তৃতীয় সালে আবার অহুদ প্রান্তে সংঘটিত হয় আর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা এক হাজার জন থাকার কথা ছিল। কিন্তু পথিমধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিকের প্ররাচনায় তিনশ সৈন্য যুদ্ধের ময়দানে যায়নি। এ যুদ্ধে রাসূলের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন না করার কারণে মুসলমানরা এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে ছিলেন। ফলে রাসূলের দাঁত মোবারক এ যুদ্ধে শহীদ হয়। তা ছাড়া হযরত হামযা ও হানযালাসহ সত্তর জন সাহাবী এ যুদ্ধে শাহীদ হন। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হয়েছিল।

চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরীতে বীরে মাউনায় সত্তর জন সাহাবী এক সড়যন্ত্রের শিকার হয়ে শহীদ হন। তাছাড়া এ বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ ও খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ষষ্ঠ হিজরীতে ঐতিহাসিক হোদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাহ্যিক দিক থেকে হোদায়বিয়া সন্ধির শর্তগুলো মুসলমানদের বিপ্লব মনে হলেও মূলত এই হোদায়ইবিয়ার সন্ধির শর্তাবলীই পরবর্তীকালে মক্কা বিজয়ের মত রক্তপাতহীন বড় বড় বিজয়ের মাইলফলক হিসাবে কাজ করেছে।

www.pathagar.com

সপ্তম হিজরীতে ঐতিহাসিক খায়রার বিজয় সংঘটিত হয়। তাছাড়া মুসলমানরা হোদায়বিয়া সন্ধির বছর যে ওমরা ত্যাগ করেছিল, তিন দিন মক্কাতে অবস্থান করে যথাযথভাবে আদায় করেন। এ বছর হযরত আমর ইবনুল আস ও সাহসী বীর সৈনিক হযরত খালিদ বিন ওলীদ ইসলাম গ্রহণ করেন।

অষ্টম হিজরী ছিল মুসলমানদের জন্যে বিজয়ের বছর। কারণ এই বছর মাত্র তিন হাজার মুসলমান দেড় লক্ষাধিক রোমান সৈন্যের মোকাবেলা করে ঐতিহাসিক মুতার বিজয় লাভ করেন। তবে এ যুদ্ধে সেনাপতি যায়েদ, জাফর ও আবদুল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন। এর পর পরই সংঘটিত হয় রক্তপাতহীন মক্কা বিজয়, সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠতম বিজয়। হোদায়বীয়া সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল দশ বছরের জন্যে, কিন্তু মক্কার কাফের মোশরেকরা দুই বছর অতিবাহিত হতে না হতেই এই চুক্তি ভঙ্গ করে। রাসূল (সঃ) বুঝতে পারলেন তাদের সাথে যুদ্ধ ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। তাই তিনি গোপনে গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন এবং অষ্টম হিজরীর রমযান মাসের দশ তারিখে দশ হাজার সাহাবীর এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা বিজয় করেন। মক্কা বিজয়ের পরে রাসূল (সঃ) সকলের জন্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং তৌহিদের প্রাণকেন্দ্র বায়তুল্লাহ হতে ৩৬০টি মূর্তি বের করে তথায় আযান দিয়ে নামায আদায় করা হয়।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল মক্কায় পনর দিন অবস্থান করার পর হযরত হাত্তাব ইবনে উসাইদকে মক্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে মদীনায় ফিরে আসেন। ঠিক এমন সময় হাওয়াযিন ও সাফকী গোত্র পৌত্তলিকতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার্থে হোনায়নে জমায়েত হয়। তখন রাসূল (সঃ) ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে এই যুদ্ধে রওয়ানা হন। এ যুদ্ধে

www.pathagar.com

মুসলমানদের বিজয় হয়েছিল তবে প্রথম দিকে আত্মগোপনকারী কাফেরদের অতর্কিত আক্রমণে মুসলমানরা বিছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলমানরা এভাবে বিজয় লাভ করতে থাকলেন এবং তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে এমনি করে দশ হিজরীতে হজ্জের সময় নিকটবর্তী হয়ে আসে রাসূল (সঃ) ২৫ যিলকদ লক্ষাধিক সাহাবী নিয়ে জীবনের শেষ হজ্জ পালনের উদ্দেশে রওয়ানা হন। হজ্জ পালনকালে ৯ই যিলহজ্জ তারিখে রাসূল (সঃ) আরাফার ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। এ ভাষণে নারীর অধিকার নিশ্চিত করণ অন্যায়ভাবে হত্যার প্রতিবাদ, সুদ ঘুষ হারাম, দাস দাসীর সদ্ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে ইসলামকে পরিপূর্ণ ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করেন, মহান আল্লাহ আরাফার ময়দানে অহী পাঠালেন- "আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। এবং আমি তোমাদের জন্যে আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করেছি।

চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ দুনিয়ার বুকে যত নবী রাসূলের আগমন ঘটেছে তাঁদের মধ্যে আমাদের প্রিয় নবী ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যার জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তিনি ছিলেন ইয়াতীম হিসাবে সকলের স্নেহের পাত্র, স্বামী হিসাবে প্রেমময়, পিতা হিসাবে স্নেহের আধার, বন্ধু হিসাবে বিশ্বস্ত একা ধারে সফল ব্যবসায়ী, দূরদর্শী সংস্কারক বীর যোদ্ধা, নিপুণ সেনাধিনায়ক, নিরপেক্ষ বিচারক, মহৎ রাজনৈতিক এবং আরো অনেক কিছু। সকল ক্ষেত্রেই তিনি সততা, ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব সাফল্য সহকারে কর্তব্য সম্পাদন করে গেছেন। সর্বক্ষেত্রেই তিনি যথোপযুক্ত সংস্কার সাধন করে কলুষমুক্ত করে গেছেন।

www.pathagar.com

নবুয়তের ২৩টি বছরে সভ্যতা বিবর্জিত ধর্মহীন আরব জাতিকে এক সুসভ্য ধর্মাশ্রিত জাতিতে পরিণত করেন। শেরেক আর মূর্তিপূজার অন্ধকুপ হতে উঠিয়ে তৌহিদ, নীতিবোধ ও ন্যায়বিচারের উত্তম স্তরে উন্নীত করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে শত্রু মিত্র মুসলমান অমুসলমান সকলে ছিল সমান। আত্মার মহত্ত্ব অন্তরের পবিত্রতা, সুরুচিপূর্ণ মনোভাব ও কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল তাঁর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, মোট কথা, সর্বকালের সর্বযুগের এই শ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর মধ্যে সকল প্রকার চারিত্রিক গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। আল্লাহ তাআল্লা বলেন, নিশ্চয়ই আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন মহান আদর্শের বিরল প্রতীক, আল্লাহ তায়ালা বলেন, অবশ্যই তোমাদের জন্যে রাসূলের জীবনে রয়েছে সুন্দর আদর্শ।

ইনতেকাল ঃ আরাফাতের ময়দানে আলকোরআনের সর্বশেষ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে রাসূল (সঃ) আস্তে আস্তে দূর্বল হয়ে পড়েন। তখন ১১ হিজরীর সফর মাস। ২৮ সফর বুধবার রাতে রাসূল (সঃ) মদীনার "জান্নাতুল বাকী" গোরস্থানে যান এবং কবরবাসীর মাগফেরাত কামনা করে দোআ করে ফিরে আসার পরে প্রচন্ড মাথা ব্যথ্যা অনুভব করতে লাগলেন। এরপর তের দিন পর্যন্ত তিনি জ্বরে ভূগছিলেন। সকল স্ত্রীর নিকট হতে অনুমতি গ্রহণ করে রাসূল (সঃ) আয়েশা সিদ্দীকার ঘরে শয্যা গ্রহণ করেন। ক্রমশ পীড়া বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন কি মসজিদে নববীতে নামায পড়তে যাওয়াও তাঁর জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে কোন মতে দুই জন সাহাবীর কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন এবং আবু বকর (রাঃ)-কে ইমামতির হুকুম দেন। এ সময় আবু বকর (রাঃ) প্রায় ১৭ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করেন।

www.pathagar.com

নবীর পীড়া দেখে সাহাবাগণও ব্যথিত মর্মহত ও হীনবল হয়ে পড়তে শুরু করলেন। তখন প্রিয় নবী বললেন, হে সাহাবীরা! তোমরা নাকি আমার মৃত্যুর আশঙ্কায় চিন্তিত হয়ে পড়েছ। দেখ, কোন নবীই চিরদিন জীবিত ছিলেন না। অতএব আমিও জীবিত থাকবো না। আমি আল্লাহর সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি, তোমরাও আমার সাথে মিলিত হবে। মিলনের স্থান হলো হাউযে কাউসার। এমনি করে রাসূল বিভিন্ন রকম সান্ত্বনা বাণী শুনিয়ে সাহাবাদের ভগ্ন হৃদয়ে সান্ত্বনা দেন।

আস্তে আস্তে রাসূলের পীড়া আরো বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সাহাগণও ব্যকুল হয়ে পড়লেন। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের বারই রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার বিশ্ব মানবের মুক্তিদূত শান্তির নায়ক হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এ দুনিয়া হতে চির দিনের জন্যে বিদায় নিয়ে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন।

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী

ভূমিকা ঃ যে সকল মুসলীম মনীষী ফারসী ভাষায় মুসলিম জাতির মধ্যে ইসলামী মূল্যোবোধ ও ধর্মীয় চেতনা পুনর্জীবিত করেছেন, মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন ফারসী ভাষায় ইসলামী দর্শন ও মুসলিম সুফীতত্ত্বের অন্যতম ভাষ্যকার। তাঁর রচিত মসনভী শরীফের মত আরো কতিপয় বিরল রচনা সুদীর্ঘ সাতশত বছর ধরে মুসলমানদের নিকট সাদরে গৃহীত

www.pathagar.com

হয়ে আসছে। আর তিনি সকল মুসলমানের হৃদয়ে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। ইসলামী দর্শন ও মুসলিম সুফীবাদের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অতুলনীয়।

জন্ম ও নামকরণ ঃ মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দ ৩০শে সেপ্টেম্বর খোরাসানের বলখ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন হুসাইন আল বলখী। তবে তিনি রুমী নামেই সবচেয়ে বেশী পরিচিতি লাভ করেন। তাঁকে এক সময় রোমে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। এ জন্যে তিনি তাঁর কবিতায় নিজেকে রুমী বলে উল্লেখ করেন এবং এ হিসাবেই রুমী নামে পরিচিতি লাভ করেন।

শিক্ষাজীবন ঃ মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পরে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। এবং ফারসী ভাষায় বিশেষ পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ফারসী ভাষায় কোরআন হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ তাসাউফ ইত্যাদি বিষয়ের উপর গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এর পর তৎকালীন যুগের সুফী সাধকগণের মুকুট মণি অর্থাৎ উচ্চ পর্যায়ের সুফী সাধক হযরত শামস তাবরেজের নিকট সুফীতত্ত্বে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

কাব্য জগতে রুমী ঃ ফারসী ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন এবং হযরত শামস তাবরেজের নিকট সুফীতত্ত্বের জ্ঞান অর্জনের পরে মাওলানা রুমী তাঁর চিন্তাধারা লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে শুরু করেন। ইসলামী ভাবধারায় ফারসী ভাষায় তিনি রচনা করলেন অসংখ্য কবিতা। রচিত কবিতাগুলো একটি পুস্তক আকারে সংকলিত

www.pathagar.com

করে নামকরণ করলেন, সুফীতত্ত্বে তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত শামস তাবরেজের নাম অনুযায়ী।

শ্রেষ্ঠ রচনা ঃ মাওলানা রুমীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বাধিক পরিচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম হল "মসনবী শরীফ"। আশি হাজার কবিতা সম্বলিত এ বিরল রচনা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র সর্বজন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এ মসনবী শরীফে তিনি আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষ করে এ গ্রন্থখানিতে মুসলিম দর্শন ও সুফীতত্ত্ব নিয়ে অত্যন্ত মনোরম ভাষায় আলোচনা করা হয়।

রুমীর তরীকা ঃ মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী তাঁর সুফীতত্ত্ব জ্ঞান ও ইসলামী তথা মুসলিম দর্শনের আলোকে "মৌলভিয়া" নামে এক নতুন তরীকার প্রবর্তন করেন। মৌলভিয়া দরবেশী তরীকার অনুসারীরা তাঁদের সততা সাধুতা, শোকাবহ পোশাক সমবেত সঙ্গীতের জলসায় ভাবাবেগের জন্যে সকলের নিকট পরিচিত। তাঁর তরীকার অনুসারী দরবেশরা তাদের মজলিসে বা জলসায় ঘুরে ঘুরে এক বিশেষ ধরনের নাচ নেচে থাকেন। মনে হয় তাঁদের এ সকল ক্রিয়াকর্মের উদ্দেশ্য যেন কোন এক প্রকার অতীন্দ্রিয় আনন্দ উল্লাস ভোগ করা। তবে নিঃসন্দেহে স্বরচিত এ কথা বলা যায় না যে, এ সকল কাজকর্ম মাওলানা রুমী নির্দেশিত ছিল।

মসনবী রচনার সময়কাল ঃ জালালুদ্দীন রুমীর হোসসামুদ্দীন নামে একজন প্রিয় শিষ্য ছিল। তিনি রুমী (রঃ)-কে তাঁর জীবনের সব আলোচনা, উপদেশাবলী, নৈতিক ভাবধারা ও

www.pathagar.com

সূফিবাদ সম্পর্ক চিন্তাধারা কবিতা আকারে লেখার প্রস্তাব দেন। মাওলানা রুমী তাঁর শিষ্যে এ প্রস্তাব সম্মত হয়ে ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দে মসনবী শরীফ কবিতা আঁকারে বলতে ও লেখতে শুরু করেন, এবং সুদীর্ঘ সতরটি বছর অক্লান্ত সাধনার বিনিময়ে ৮০ হাজার লাইন সম্বলিত হয় সাত খন্ডে বিভক্ত এই বিশাল গ্রন্থ মসনবী শরীফ ১২৭৫ খ্রীস্টাব্দে রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। অবশ্য মাঝখানে কিছু দিনের জন্যে লেখা বন্ধ ছিল। মসনবী শরীফের আরো কটি খন্ড আছে; মূলত সে খন্ডটি মাওলানা রুমির রচিত মসনবীর অংশ নয় বরং তা পরবর্তীতে রচনা করে মসনবী নামকরণ করা হয়।

মৃত্যু ঃ এই মহামনীষী, ফারসী কাব্য জগতের পূর্ণ চন্দ্র সুফী জগতের মহান দরবেশ, বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ মসনবী প্রণেতা মাওলানা রুমী (রঃ) ১২৭৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ১৭ তারিখ ইহজগতের স্নেহ মায়া মমতা ভালবাসা ত্যাগ করে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরকালের পথে যাত্রা করেন। ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজউন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কবরকে নূরেরআলোয় আলোকিত করুন এবং জান্নাতকে তাঁর আবাসস্থল করুন। আমীন।

www.pathagar.com

ইবনে খালদুন

ভূমিকা ঃ ইতিহাস জগতের পূর্ণ চন্দ্র, দর্শন জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র অমৃত কণ্ঠ, অক্লান্ত পক্ষ আরবী সাহিত্যকাশের খ্যাতনামা মুসলিম মনীষী ছিলেন ইবনে খালদুন। ইতিহাস জগতে তাঁর অতুলনীয় অবদান আজও মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে আসছে; এমনকি বিশ্বের প্রচলিত বিভিন্ন ভাষায় তাঁর ইতিহাস ও দর্শন অনূদিত হয়েছে। তিনি ছিলেন এমন একজন ঐতিহাসিক, মহা জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি, যিনি বিচ্ছিন্ন কিন্তু পরস্পর সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ থেকে সর্বগ্রাহী সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। তাঁর রচিত ইতিহাস গ্রন্থে তিনি প্রত্যেক জাতির উত্থান পতনের কারণগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তিনি ভাবীকালের ঐতিহাসিকদের নিকট ইতিহাসের ভাবধারা ঠিক পথে কাজে লাগাবার পদ্ধতির ব্যাপারেও তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

জন্ম ও বংশ পরিচিতি ঃ ইবনে খালদুনের পূর্বপুরুষগণ আরব দেশের অধিবাসী ছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা আন্দুলুসিয়া তথা তিউনিসে স্থানান্তরিত এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন। ৭৩৪ হিজরীতে ইবনে খালদুন আন্দুলিসিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইবনে খালদুনের প্রকৃত নাম হলো আবদুর রহমান। কুনিয়াত আবু যায়েদ এবং উপাধি ছিল ইবনে খালদুন। তাঁর পিতার নাম ছিল মোহাম্মদ বিন আবু বকর বিন হাসান বিন খালদুন।

www.pathagar.com

শিক্ষাজীবন ঃ আবদুর রহমান ইবনে খালদুন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইবনে সাদের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এর পরে কোরআন শরিফ মুখস্থ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পরে তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, আইন ও তর্কশাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর গভীর ভুৎপত্তি অর্জন করেন। অতি অল্প বয়সেই ইবনে খালদুন এভাবে একের পর এক জ্ঞান রাজ্যের সীমা অতিক্রম করতে থাকেন তাঁর জ্ঞান প্রজ্ঞা, সাহিত্য ও দর্শনের কথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। জ্ঞান অর্জন করতে করতে তিনি এমন এক স্তরে উপনীত হন যে তৎকালীন যুগে তাঁর সমকক্ষতা অর্জন করার মত কোন জ্ঞানীর সন্ধান পাওয়া যায় না।

কর্মজীবন ঃ ইবনে খালদুনের জ্ঞান গড়িমায় মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন তালমিস্তানের শাসনকর্তা তাকে নিযুক্ত করেন, তালমিস্তানের শাসনকর্তা ইবনে খালদুনকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, কিন্তু পরবর্তীতে অজ্ঞাত কারণে ইবনে খালদুনের উপর তালমিস্তানের শাসনকর্তা অসুন্তষ্ট হন এবং ৭৬০ হিজরীতে খালদুনকে কারাগারে বন্দী করেন। ৭৬৪ হিজরীতে তালমিস্তানের শাসন কর্তা মৃত্যু বরণ করার পর ইবনে খালদুন কারাগার থেকে মুক্তি পান কারাগার হতে মুক্তি পাবার পর ইবনে খালদুন গ্রানাড়ায় চলে যান। গ্রানাড়ায় যাওয়ার পরে সেখানকার সুলতান আবু আবদুল্লাহ ইবনে খালদুনকে অত্যন্ত জাঁকজমক ও আনন্দ উদ্দীপনার মাধ্যমে অভিনন্দন জানিয়ে সাদরে গ্রহণ করেন। ইবনে খালদুন সুলতান আবু আবদুল্লাহর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বাকী জীবন গ্রানাড়ায় কাটিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তা হলোনা। কিছুদিন পরে গ্রানাড়া ছেড়ে পুনরায় তালমিস্তানে ফিরে

www.pathagar.com

আসতে হয় এরপর থেকে তিনি রচনা শুরু করলেন তাঁর অমর কর্তি তারিখে ইবনে খালদুন এবং মুকাদ্দামাতু ইবনে খালদুন। মুকাদ্দার্মাতু ইবনে খালদুন বা ইবনে খালদুনের ভুমিকা আজ বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এমনকি ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও সুফাদ্দসাত ইবনে খালদুন বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

তালমিস্তানে চারটি বছর থাকার পরে পুনরায় তিনি বিদেশ সফর শুরু করেন। প্রথমেই তিনি আলেকজন্দ্রিয় সেখান থেকে মিসরের রাজধানী কায়রোতে যান। সেখানে গিয়ে প্রাচীন কাল হতে বিশ্ববিখ্যাত জন নন্দিত আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিষয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে শিক্ষাদান কর্মে ব্রতী হন। শিক্ষাদানে তাঁর প্রজ্ঞার সুনাম সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এমনকি তৎকালীন সুলতান তাঁর জ্ঞান গড়ীমায় মুগ্ধ হয়ে ইবনে খালদুনকে ৮৭৬ হিজরীতে মালিকিয়ার কাযী নিযুক্ত করেন। ইবনে খালদুনের জ্ঞান গড়ীমা ও বিচার বুদ্ধির জন্যে সুলতান ও তাঁর মন্ত্রী-পরিষদের সকলেই তাঁকে অত্যন্ত আদর স্নেহ ও সম্মান করতেন।

কাযী নিযুক্ত হওয়ার পরে ইবনে খালদুন তাঁর পরিবার পরিজনকে তিউনিসিয়া থেকে মিসরে আনবার আগ্রহে অধীর অস্থির হয়ে উঠেন। ওদিকে পরিবার পরিজনও নিকট আসার জন্য জাহাজে করে মিসকাররে রওয়ানা। কিন্তু ইবনে খালদুনের আশার প্রদীপ নিভে যায় নিরাশার অন্ধকারে। পথিমধ্যে প্রবল ঝড়ে জাহাজখানা ডুবে ইবনে খালদুনের পরিবার পরিজন মারা যায়।

হজ্জ পালন ও রচনা সমাপ্ত ঃ পরিবার পরিজনের মর্মান্তিক মৃতুতে ইবনে খালদুন শোকাহত হলেও একেবারে ভেঙ্গে পড়েননি। অনবরত অত্যান্ত সাহসিকতার সাথে তিনি কাজ চালিয়ে যান , এবং ৭৮৯ হিজরীতে হজ্জ পালন করার জন্যে মিসর হতে মক্কা

www.pathagar.com

শরীফ যান। হজ্জ শেষ করে তিনি তাঁর অমর কীর্তি তারীখে ইবনে খালদুন এবং তার ভূমিকা রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। এর পরে সুলতান আবদুল আজীজের হাতে তুলে দেন। সুলতান আবদুল আজীজ ইবনে খালদুন তার অক্লান্ত সাধনার বিনিময়ে যে অমর কীর্ত রচনা করেন তার জন্যে তাঁকে বহু মূল্যবান উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

মুকাদ্দামার বিষয় ঃ ইবনে খালদুন যে মুকাদ্দাম বা ভূমিকা রচনা করেন তাতে বিশেষ করে ছয়টি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। তা হলো নিম্নরূপঃ

১। জাতির উত্থান পতন সম্পর্কীয়
২। সামাজিক অবস্থা সংক্রান্ত।
৩। কর্মমুখী রাজনীতির নিয়ম সংক্রান্ত।
৪। সমর কৌশল সংক্রান্ত।
৫। রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক।
৬। আরবী ভাষা সাহিত্য সম্পর্কিত।

মৃত্যু ঃ যখন এই মুসলিম মনীষীর গ্রন্থ রচনার কাজ সমাপ্ত হল এবং তাঁর জ্ঞানভান্ডারের সুনাম সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো তখন তাঁর তিউনিস ও আন্দুলিসিয়ার অধিবাসীগণ তাঁকে মিসর হতে দেশে ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু মিসর থেকে চলে যাওয়ার কথা কখনো ইবনে খালদুনের মনেও পড়তো না। এমনি করে তিনি তাঁর দায়িত্ব চালিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত ৮০৮ হিজরীতে মিসরের যমীনেই ইন্তেকাল করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন। আমীন।

www.pathagar.com

ইমাম বোখারী (রঃ)

ভূমিকা ঃ হাদীস শাস্ত্রের পন্ডিত মোহাদ্দেসীনের সর্দার হযরত ইমাম বোখারী (রঃ)-এর নামটি নিক সর্বসাধারণ মুসলমানদের সমাধিক পরিচিত। যার তীক্ষ্ম মেধা, বুদ্ধি ও মুখস্থ শক্তি সমকালীন সকল, মোহাদ্দেস, পন্ডিত, দার্শনিক ও আলেমদেরকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। হাদীস সংকলনের কাজে যে সকল মোহাদ্দেস তাঁদের জীবন অতিবাহিত করেছিলেন, ইমাম বোখারী (রঃ) তাদের সকলের শীর্ষস্থানীয়। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে যত মোহাদ্দেসেরই আবির্ভাব হয়েছে, কেউঁই ইমাম বোখারী (রঃ)-এর সমকক্ষতা লাভ করতে পারেন না। এ জন্যে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খোযায়মা যথার্থই বলেছেন আমি আকাশের নীচে এমন কোন ব্যক্তি দেখতে পাইনি যেব্যক্তি হাদীস সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ)-এর চেয়ে বেশী জানে।

জন্ম ঃ ইমাম বোখারী (রঃ) ১৯৪ হিজরী সালের পবিত্র শাওয়াল মাসের ১৩ তারিখ রোজ শুক্রবার জুময়ার নামাযের পরে মুসলিম অধ্যুষিত ইসলামী সভ্যতার সংস্কৃতি লীলাভূমি বর্তমান এশিয়া মহাদেশের রুশ সম্রাজের অন্তর্ভুক্ত বোখারা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বোখারা বর্তমান ইরানের সমরকন্দ শহর হতে ৩০০ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত।

www.pathagar.com

নাম ও পরিচিতি ঃ বোখারী (রঃ)-এর নাম মুহাম্মদ উপনাম আবু আবদুল্লাহ এবং গুণবাচক নাম অনেক। মধ্যে আমীরুল মুমেনীন ফিল হাদীস, হাফিযুল হুজ্জাত, ইমামুদ দুনিয়া ফিল হাদীস, ইমামুল হুমাম নাসীরু আহাদীসিন নবুবিয়্যাহ ও নাসিরু মাওয়ারিসে মোহাম্মদিয়াহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য তাঁর পিতার নাম ইসমাইল ইবনে ইব্রাহীম ইবনে মুগীরা। ইমাম বোখারী (রঃ)- এর নাম হলো মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইইল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা বারদীবা আল যুফী আল-বোখারী (রঃ) ।

শৈশবকাল ঃ মাওলানা মোহাম্মদ আবুল হাসান তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ মেশফাতের ব্যাখ্যা গ্রন্থ তানযীমুল আশতাত উল্লেখ করেন, হযরত ইমাম বোখারী (রঃ) শৈশব কালে অন্ধ ছিলেন। জন্মান্ধ হয়েই তিনি এ পৃথিবীতে আগমন করেন। এরপর ইমাম বোখারী (রঃ)-এর মা আল্লাহর দরবারে দোয়া করার পরে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ভাল করে দেন এবং তিনি সুন্দর দুটি চোখ ফিরে পান। শৈশব হতেই ইমাম বোখারী (রঃ)-এর মধ্যে দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। পরকালের প্রতি তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। ছোট কাল থেকেই তিনি হালকা পাতলা ছিপছিপে দেহের অধিকারী ছিলেন। শৈশবকালেই তাঁর পিতা মারা যান।

বোখারী ও কুফী বলার কারণ ঃ প্রাচীনকালে নিয়ম ছিল, যার হাতে কেউ ইসলাম গ্রহণ করতো ইসলাম গ্রহণকারী তাঁর দিকে নিজ বংশ সম্পর্কিত করতো। এ হিসাবে দেখা যায় ইমাম বোখারী (রঃ)-এর পূর্বপুরুষ বারদীবা অগ্নিপূজক ছিলেন এবং এ অবস্থায়ই মারা যান তার পর পুরুষ ছিল মুগীরা তিনি প্রথমত

www.pathagar.com

অগ্নিপূজক ছিলেন তারপর বোখারা নগরীর তৎকালীন হাকীম ইয়ামান আল কুফীর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। তাই বোখারী (রঃ)-এর সাথে কুফী যুক্ত করে ও বলা হয় এবং বোখারা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন এই হিসাবে বোখারী নামকরণ করা হয়। তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল তিনি নামে যতটুকু পরিচিতি লাভ করেন তার চেয়ে বেশী পরিচিতি লাভ করেন বোখারী নামে।

শিক্ষা দীক্ষা ঃ শৈশবকালে পিতা মারা যাবার পরে বোখারী (রঃ) মায়ের আদর স্নেহে বড় হতে থাকেন এবং মায়ের তত্ত্বাবধানেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ছোটকাল থেকেই তিনি ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন তাই পাঁচ বছর বয়সেই তিনি স্থানীয় একটি মক্তবে ভর্তিহন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি ১০ বছর বয়সেই হাদীস শিক্ষার প্রতি গভীর মনোযোগ দেন। ইমাম বোখারী (রঃ) ১১ হতে ১৬ এই পাঁচ বছরের মধ্যে স্থানীয় সকল মোহাদ্দেসের নিকট সংগৃহীত সকল হাদীস সংগ্রহ করে মুখস্থ করে ফেলেন। স্থানীয় মোহাদ্দেসগণের থেকে জানা হাদীসসমূহের উপরে, তিনি তাঁর হাদীস অধ্যয়নের কাজ সমাপ্ত করেননি। বরং হাদীস সম্পর্কে আরো অধিক জ্ঞান আহরণের জন্যে বিদেশ যাত্রার প্রস্তুতি নেন।

হাদীস শিক্ষার্থে বিদেশ গমন ঃ ২১০ হিজরী সালে ইমাম বোখারী (রঃ)-এর বয়স যখন ১৬ বছর, তখন তাঁর ভাইও মাকে নিয়ে হজ্জ করার উদ্দেশে পবিত্র মক্কায় গমন করেন। হজ্জ আদায় করে একাধারে ছয় বছর হিজযে অবস্থান করে সেখানকার মোহাদ্দেসদের নিকট হতে অসংখ্য হাদীস সংগ্রহ করে তা মুখস্থ করেন এরপরে তিনি হাদীসসংগ্রহ করার জন্যে কুফা বসরা,

www.pathagar.com

বাগদাদ, বলখ আসকালান, হিম, দামেশক প্রভৃতি এলাকা সফর করেন এবং এসকল এলাকার খ্যাতনামা মোহাদ্দেসদের নিকট হতে অসংখ্য হাদীস সংগ্রহ করেন। তাছাড়াও তিনি সিরিয়া, জাযীরা ও মিরের প্রখ্যাত মোহাদ্দেসদের নিকট যেয়ে রাসূলের অমিত বাণী অসংখ্য মূল্যবান হাদীস সংগ্রহ করে মুখস্থ করেন। তিনি শত শত মোহাদ্দেসের নিকট হতে হাদীস সংগ্রহ করেন বোখারী (রঃ) যে কতজন মোহাদ্দেসের নিকট হতে হাদীস সংগ্রহ করেছেন তার নির্ধারিত কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদের এক বর্ণনায় ইমাম বোখারী (রঃ) একহাজার এরও অধিক সংখ্যক মোহাদ্দেসের নিকট হতে হাদীস সংগ্রহ করেন বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বোখারীর মুখস্থ শক্তি ঃ বোখারী (রঃ) অত্যধিক স্মরণ শক্তি ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। তিনি একবার যা শুনতেন জীবনে তা কখনো ভুলতেন না। কোন বিষয় একবার শুনলেই তা মুখস্থ হয়ে যেত। দ্বিতীয় বার পড়ার বা শুনার প্রয়োজন হত না তাঁর এই তীক্ষ্ম মেধার কারণেই তিনি এক লাখ সহীহ হাদীস মুখস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং যে কোন সময় তিনি সনদসহবলে দিতে পারতেন। কোন হাদীস তিনি যেখানে যেভাবে শুনতেন ঠিক সেরকম বর্ণনা করতে পারতেন। তাঁর বয়স যখন ১৬ বছর তখন দাখেলী নামে তদানীন্তন একজন মোহাদ্দিস হাদীস বর্ণনায় ভুল সনদ বলেন তখন তিনি বলে দিলেন সনদটি এরকম না সঠিক সদন এরকম ইমাম বোখারী যে ভাবে সনদের উল্লেখ করে না তাই সঠিক ও নির্ভুল তাছাড়া ১৬ বছর বয়সে তিনি ইমাম তাকী ও ইবনে মুবারকের সংগৃহীত সব হাদিস মুখস্থ করে ফেলেন।

www.pathagar.com

তাছাড়া তিনি একবার বাগদাদে গমন করলে বাগদাদের তৎকালীন আলেম ও মোহাদ্দেসগণ তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যে একশ' হাদীসের সনদ ও মতন উলটপালট করে তাঁর সামনে উপস্থাপন করেন। ইমাম বোখারী (রঃ) এ সকল হাদীস শুনার পরে বলে দিলেন। এই হাদীস গুলোর সনদ ও মতন ঠিক নয়। বরং আমি যেটা বলছি এটাই এ সকল হাদীসের সঠিক সনদ ও মতন সঠিক। সনদ ও মতন বলার পরে সবটি হাদীসই যেভাবে তাঁর সামনে উলটপালট করে বলা হয়েছিল, সেরকম তাদের নিকট পুনঃ উপস্থাপন করেন। এসকল ঘটনা দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায়, তাঁর মুখস্থ শক্তি কত প্রখর ছিল।

বোখারী রচিত গ্রন্থাবলী ঃ সর্বজনগৃহীত বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সহীহ বোখারী ছাড়াও ইমাম বোখারী (রঃ) এর অনেক গ্রন্থ আছে। সেসকল গ্রন্থের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কতিপয় গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১। বিররুল ওয়ালেদাইন।
২। কিআতু খালফিল ইমাম।
৩। আদাবুল মুফারাদ।
৪। রফাউল ইয়াদাইন ফিস সালাত।
৫। ফিতাবুল ইলাল।
৬। কিতাবুল বিজদান।
৭। কিতাবুল মাবসুত।
৮। আততারীখুস সগীর।
৯। আততারীখুল কবীর।
১০। আততারীখুল ওয়াসাত।

www.pathagar.com

১১। কিতাবুজ জোআফা।

১২। খালকু আফয়ালিল ইবাদ।

১৩। আল মুসনাদুল কাবীর।

১৪। কিতাবুল হিবা।

১৫। আসমাউস সাহাবা।

১৬। কিতাবুল আশারিবা ইত্যাদি।

ইমাম বোখারী (রঃ) হাদীস সংকলনের পাশাপাশি কতিপয় ছাত্রকে হাদীসের তালীম দিয়েছিলেন। অসংখ্য অগণিত ছাত্র তাঁর কাছে থেকে হাদীসের তালীম গ্রহণ করে। এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয় যে, ইমাম বোখারী (রঃ)-এর ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় নব্বই হাজারের মত। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যারা পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ–মুসলীম শরীফ প্রণেতা।

২। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (রঃ) তিরমীজি শরীফ প্রণেতা।

৩। আবু আবদুর রহমান আননাসায়ী-- নাসয়ী শরীফ প্রণেতা

৪। আবু ইসহাক।

৫। ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মদ।

৬। আবু বকর ইবনে খোযাইমা।

৭। আবু জোরআ।

৮। আবু হাতেম।

৯। সালেহ ইবনে মুহাম্মদ।

www.pathagar.com

বোখারী শরীফ সংকলন ঃ ইমাম বোখারী (রঃ) প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সহীহ বোখারী সংকলণের কারণ হিসাবে দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

প্রথম ঘটনা ঃ বোখারী (রঃ) বলেন, একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম রাসূল পাক (সঃ)-এর সামনে একখানা পাখা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি এবং রাসূল পাকের শরীর মোবারক হতে পাখা দ্বারা মাছি তাড়াচ্ছি। এই স্বপ্ন দেখার পরে আমি কতিপয় স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারের নিকট গিয়ে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা বললেন, আপনি রাসূল পাক (সঃ)-এর উপর হতে মিথ্যা দূর করবেন। অর্থাৎ আপনি রাসূলে পাকের সহীহ হাদীসসমূহ সংকলনের কারণে কেউ নতুন করে কোন মওযু জোল হাদীস রাসূলের দিকে সম্পর্কিত করতে পারবে না। ইমাম বোখারী বলেন, স্বপ্নের এই ব্যাখ্যাই আমাকে সহীহ হাদীস সংকলনে উধুদ্ধ করে।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ ইমাম বোখারী বলেন, একদা আমি ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়র নিকট উপস্থিত ছিলাম। মজলিসে অনেক লোক বসা ছিল। হঠাৎ করে মজলিসে উপস্থিত জনৈক বলল, কেউ যদি রাসূর (সঃ)- এর সহীহ হাদীসসমূহ একখানে গ্রন্থকার সংকলণ করত তার কতই না ভাল হত। এই কথা শোনার পরে মনে রাসূলের সহীহ হাদীসগুলো গ্রন্থকারের সংকলনের আগ্রহ জাগে তখন থেকেই আমি আস্তে আস্তে সহীহ বোখারী শরীফ সংকলন আরম্ভ করি।

বোখারী শরীফ সংকলণে সতর্কতা ঃ ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ বোখারী শরীফ সংকলণের সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে কোন গায়রে সহীহ

www.pathagar.com

হাদীস স্থান দেননি তাছাড়া বোখারী (রঃ) তাঁর এই কেতাবের শিরোনামসমূহ রাসুল পাক (সঃ)-এর কবর ও মিম্বরের মাঝখানে বসে লেখেছেন এবং প্রত্যেক শিরো নাম লেখার পূর্বে দুই রাকাত নফল নামায পড়েছেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে, ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন আমি এই কিতাবের প্রতিটি হাদীস লেখার পূর্বে গোসল করে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে নিয়েছি। তাই আজ বিশ্বব্যাপী এই কিতাব খানা সর্বজন গৃহীত ও স্বীকৃত হয়েছে। এমনকি প্রখ্যাত আলেমগণ মন্তব্য করেছেন– আসাহহুল কিতাবে বাদা কিতাবিল্লাহে তাআলা সহীহুল বোখারী।

অর্থ ঃ মহান আল্লাহ তাআলার কেতাব পবিত্র কোরআন শরীফের পরে সহীহ কিতাব হলো ইমাম বোখারী (রঃ)-এর সহীহ বোখারী।

বোখারী শারীফ সংকলণের সময়কাল ও হাদীস সংখ্যা ঃ বোখারী (রঃ) সুদীর্ঘ ১৬ বছর অক্লান্ত সাধনার বিনিময়ে সহীহ বোখারী শরীফ সংকলন করেন। ছয় লাখ হাদীস থেকে বাছাই করে তিনি এই হাদীস গ্রন্থ সংকলণ করেন। বোখারী শরীফে সনদসহ বর্ণিত পুণরাবৃত্তি হাদীসের সংখ্যা মোট ৭২৭৫ আর পুণরাবৃত্তি ব্যতীত হাদীসের সংখ্যা প্রায় চার হাজার তবে কারো কারো মতে পুণরাবৃত্তি কৃত হাদীস সমস্ত বোখারীতে মাত্র একখানা, আর তাহলো রুমালের বর্ণনা সংক্রান্ত হাদীস। অন্য সকল হাদীস হুবহু পুণরাবৃত্তি নয় এবং তাহাতে কিছু না কিছু পার্থক্য আছে তবে আবু হাফসার এক বর্ণনায় বলা হয়েছে বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসের সংখ্যা সাত হাজার ছয় শতেরও অধিক। ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ)-এর মতে,

www.pathagar.com

বোখারী শরীফের হাদীস সংখ্যা মোট সাত হাজার তিন শত সাতানব্বই তবে মুতাবাআত ও মুআল্লাক হাদীসসহ বোখারী শরীফে সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা নয় হাজার বিরাশি, শিরোনাম সংখ্যা মোট তিন হাজার চার শত পঞ্চাশ এবং বিতাবের সংখ্যা মোট আটানব্বই।

বোখারীর দানশীলতা ঃ ইমাম বোখারী (রঃ)-এর বদন্যতা দানশীলতা তৎকালীন সকল বদান্যতা দানশীলতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বোখারী (রঃ) তাঁর পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে অজস্র ও অসংখ্য ধন সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। এবং এই সকল ধন সম্পদ গরীব দুঃখী মানুষের মধ্যে বিতরণ করে দিয়ে বদান্যতার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাছাড়া তিনি নিজ ছাত্রদের প্রতিও বেশ যত্নশীল ছিলেন। ছাত্রদের পড়ালেখার দিকে তিনি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদেরকে দান করে তাদের লেখাপড়ার সাহায্য সহযোগিতা করতেন। এভাবে তিনি গোটা জীবন পরের স্বার্থে উৎসর্গ করে গেছেন। কখনো তিনি দুনিয়ার সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রতি আকৃষ্ট হননি।

মৃত্যু ঃ হাদীস শাস্ত্রের এই মহাজ্ঞানী, আধ্যাত্মিক জগতের প্রিয়, বিশ্ব মুসলিমের হৃদয়ের ভালবাসা কেড়ে নেয়া এই মানুষ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম ইবনে মুগীরা ইবনে বদীয়বাহ আল যুফী আলবুখারী (রঃ) তাঁর অমর অক্ষয় কীর্তি সহীহ বোখারী ও আরো অসংখ্য বিরল রচনাবলী আমাদের হাতে তুলে দিয়ে ২৫৬ হিজরী সনে ৬১ বছর ১১ মাস ১৭ দিন বয়সে ঈদুল ফিতরের রাত রোজ শনিবার এশার নামাযের সময় এ দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে পর কালের পথে যাত্রা করেন। ইন্না লিল্লাহ ওয়া-ইন্না ইলাইহ রাজেউন।

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানীফা

ভূমিকা ঃ বিশ্ববরেণ্য ফকীহ ইমামকুল শিরোমনী ইমামুল আয়েম্মা ইমাম আযম আবু হানীফা (রঃ) ইতিহাসের পাতায় বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। এলমে ফিকাহর জগতে তাঁর অতুলনীয় অবদান সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধি সমকালীন বিশ্বের সকল জ্ঞানী গুণীর বিচার বুদ্ধিকে হার মানিয়েছিল। তৎকালীন যুগের সকল মনীষীই তাঁর সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন। জীবনের এক বিরাট অংশ তিনি ফিকহী মাসায়েল সম্পাদনার কাজে নিয়োজিত করে মুসলিম জাতীকে এক সুন্দর পথনির্দেশ দিয়ে যান। বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান তাঁর ফিকহী মাযহাব গ্রহণ করে ধন্য হয়ে চলেছে।

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ ইমাম আযম আবু হানীফা (রঃ) হিজরী ৮০ সনে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সাবেত এবং দাদার নাম যাওতা। তিনি কাবুলের অধিবাসী ছিলেন। ইমাম সাহেবের প্রকৃত নাম নোমান এবং লকব বা উপাধি ইমাম আযম কুনিয়াত আবু হানীফা। আবু হানীফা নামেই সকলের নিকট সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। আমাদের ইমাম সাহেব এবং তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা সাবেত উভয়ে তাবেয়ী আবু হানীফা (রঃ)-এর পিতা সাবেত ধন সম্পদের মালিক ছিলেন। এত অধিক ধন সম্পদের মালিক ছিলেন যে ঐ সময় খলীফাদের নিকট তিনি শাহী হালুয়া পেশ করতেন।

www.pathagar.com

শৈশবকাল ঃ শৈশবকালে ইমাম আযমের পিতা সাবেত মারা যান। এর পরে তিনি মাতৃক্রোড়ে লালিত পালিত হন এবং প্রাথমিক কিছু জ্ঞান অর্জন করেন। এক পর্যায়ে আবু হানীফা (রঃ)-এর শ্রদ্ধেয় মাতা ইমাম জাফর সাদেক (রঃ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধন হয়ে পুনরায় বিবাহ বসেন এবং তার সাথে ঘর সংসার করতে থাকেন। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও তাঁর মায়ের সাথে ইমাম জাফর সাদেকের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। পিতা সাবেতের মৃত্যুর কারণে বাকী জীবনটুকু হাসি কান্না সুখ দুঃখ ও আনন্দ বেদনার মধ্যে অতিবাহিত হয়।

শিক্ষা জীবন ঃ ইমামকুল শিরোমনী নোমান ইবনে সাবেত তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও মেধা শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সে ও অল্প সময়ে পবিত্র কোরআন শরীফ মুখস্থ করেন। তিনি বেশী বেশী করে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। বর্ণিত আছে, ইমাম সাহেব প্রত্যেক রমযান মাসে একষট্টি বার কোরআন খতম দিতেন, ইমাম সাহেব প্রথম দিকে পড়ালেখার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। তবে কখনো মক্তবে যাওয়া থেকে বিরত থাকেননি। ব্যবসা নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতেন। একদিন কুফার প্রখ্যাত আলেম ইমাম শাবী (রঃ) ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-কে প্রশ্ন করেন, তুমি প্রতিদিন এ পথ দিয়ে কোথায় কোন্ আলেমের কাছে যাও। তখন আবু হানীফা (রঃ) বললেন, না তা আমি কোন আলেমের নিকট যাই না; বরং ব্যবসার কাজে নিয়মিত বাজারে যাই। তখন ইমাম শাবী (রঃ) ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-কে বললেন আলেম ওলামা মজলিসে গিয়ে বসো। তোমার মধ্যে অনেক মেধা আছে বলে মনে হয়। ইমাম শাবীর একথা শুনার পর থেকে ইমাম আবু হানীফা দ্বীনী এলেম

www.pathagar.com

বিশেষত ইলশে ফেকাহর বিশেষ অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তবে ফেকাহ শাস্ত্রে প্রথাগত শিক্ষা লাভের পর সর্বপ্রথম এলমুল কালাম শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু কিছু দিন এ বিষয়ে শিক্ষা অর্জনের পরে তিনি বুঝতে পারলেন। এ শিক্ষার পরিণতি খারাপ এবং এ দ্বারা খুব কম সংখ্যক মানুষই উপকৃত হবে। তার পরে পদ্য সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা করে দেখলেন, এ শিক্ষায় অনেক মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সাহিত্যের শ্রুতি মাধুর্য রক্ষা করতে হয়। তাই তিনি আর সাহিত্যের দিকে গেলেন না। তাছাড়া কিছুদিন হাদীস শিক্ষা করেও হাদীস সংকলন সম্পর্কে চিন্তা করে দেখলেন, হাদীস সংকলন করলে অনেক মিথ্যা বর্ণনাকারীর সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ সকল চিন্তার পরে হাম্মাদ ইবনে সুলাইমান নামক তৎকালীন বিখ্যাত আলেম কর্তৃক জনৈক মহিলাকে দেয়া একটা ভুল মাসাঅলার কথা তিনি শুনতে পেয়ে ফেকাহর বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার জন্য দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করেন। হিজরী একশত সালে তিনি হাম্মাদ ইবনে সুলাইমানের শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয়ে তিনি একাধারে দশ বছর অধ্যয়ন করেন এবং সকলের নিকট যথাযোগ্য মর্যাদার আসন লাভ করেন। বিশেষ করে তাঁর ওস্তাদ হাম্মাদ ইবনে সুলাইমান তাঁকে অত্যন্ত আদর যত্ন করতেন এবং সুগভীর জ্ঞান দান করতে থাকেন। পুরনায় ইমাম সাহেব কুফার মোহাদ্দেসগণের নিকট গিয়ে হাদীস শিক্ষা করেন। কুফার মুহাদ্দেসদের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা করার পরে বাকী জীবন তিনি এলমে ফেকাহর গবেষণায় অতিবাহিত করে।

সাহাবাদের সাক্ষাত ঃ ইবনে হাজার মক্ক (রঃ) মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, ইমাম আবু হানীফা সর্বমোট আট জন সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন।

www.pathagar.com

* মোররুল মুখতার কিতাবের ভূমিকায় আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী (রঃ) উল্লেখ করেন। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বিশ জন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন।

* কারো কারো মতে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সাত জন সাহাবীর নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) যেসকল সাহাবীদের সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চার জন সাহাবী হলেন।

১। হযরত আনাস ইবনে মালেক।
২। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা।
৩। সাহ্‌ল ইবনে সায়দ।
৪। হযরত আবু তোফায়েল।

কর্মজীবন ঃ কর্মজীবনে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ফলে তিনি অনেক ধন সম্পদের মালিক ছিলেন। এ সকল ধনসম্পদ বিভিন্ন জনকল্যাণ ও সেবামূলক ব্যয় করতেন। তাছাড়া ইমাম সাহেবের ওস্তাদ হাম্মাদ ইবনে সুলায়মান ১২০ হিজরী সনে মারা যাওয়ার পর তিনি তাঁর ওস্তাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। শিক্ষকতার জীবনে প্রবেশ করার প্রাক্কালে ইমাম আবু হানীফা একদিন স্বপ্নে দেখলেন। তিনি রাসূল পাক (সঃ)-এর কবর খুড়ছেন। এ স্বপ্ন দেখার পরে তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন এবং মনে করলেন এটা শিক্ষাদানে অযোগ্যতারই নিদর্শন এর পরে ইবনে সিরিনের নিকট স্বপ্নের তাবীর জিজ্ঞাসা করার পরে তিনি বললেন– আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই; বরং আপনি দ্বীনের লুপ্ত জ্ঞান পুনরুদ্ধার করবেন। এ স্বপ্ন তারই প্রমাণ। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি ফেকহী মাসআলা সংকলনের

www.pathagar.com

কাজও চালিয়ে যান। তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্য হতে ৪০ জন মেধাবী ছাত্রকে নিয়ে ফেকহ সম্পাদনা পরিষদ গঠন করেন এবং সুদীর্ঘ বার বছর অক্লান্ত সাধনার ফলে তিরাশি হাজার মাসাআলা সম্বলিত কুতবে হানফিয়া নামে একখানা বিখ্যাত ফেকাহ গ্রন্থ রচনা করেন।

রাজনৈতিক ময়দানে আবুহানীফা (রঃ) ঃ ইমাম আযম আবু হানীফা (রঃ) তাঁর জীবনের পঁচিশ বছর উমাইয়া খেলাফতের আমলে এবং আব্বাসীয় খেলাফতের আমলে আঠার বছর অতিবাহিত করেন। সুদীর্ঘ এই তেতাল্লিশ বছরে তিনি উভয় বংশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। প্রথমত তিনি উমাইয়্যদের রাজনৈতিক মতবিরোধ, হত্যাকান্ড, শান শওকত জাঁকজমক প্রত্যক্ষ করেন। তিনি দেখেছিলেন রাজধানীর প্রাচীরসমূহের ধ্বংসাবশেষ আর দেখেছিলেন আব্বাসীয়গণ কর্তৃক উমাইয়্যদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালিয়ে তাদের দুর্বল হাত থেকে সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেয়া এসব কিছু তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন বটে, কিন্তু কখনই তিনি রাজনীতির সাথে ওত প্রোতভাবে জড়িত ছিলেন না।

ইমাম আবু হানীফার সন্তান সন্ততি ঃ ইমাম অযম আবু হানীফার সন্তান সন্ততি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু বলা যায়। ইমাম আবু হানীফার ইন্তেকালের মূহূর্তে তাঁর সন্তানদের মধ্যে হাম্মাদ ছাড়া আর কেউ জীবিত ছিলেন না। হাম্মাদ একজন বড় আলেমে দ্বীন ছিলেন। তবে কোন দিন তিনি চাকুরী করেননি। শৈশব হতেই তাঁকে অত্যন্ত যত্নের সাথে এলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়া হয়, যখন হাম্মাদ আলহামদু সূরা খতম দিয়েছিলো তখন আবু হানীফা (রঃ) তাঁর ওস্তাদকে পাঁচশত দেরহাম পুরস্কার

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। এর পরে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) নিজেই পুত্রের পড়ালেখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিদ্যা বুদ্ধিতে আমল আখলাকে ও আমানতদারীতে তিনি পিতার যোগ্য সন্তান হিসাবে পরিচয় দিতে ছিলেন। পিতার মৃত্যুর সময় অনেক আমানতকৃত জিনিস তাঁর ঘরে ছিল। তা তিনি কাযীর নিকট জমা রেখে বললেন, যার যার মাল তাকে দিয়ে দিন।

চরিত্র ঃ ইমাম আযম আবু হানীফা (রঃ) উন্নত ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। কাযী ইউসুফ বলেন, ইমাম আবু হানীফা একজন ধার্মিক বীর, ন্যায়পরায়ণ চরিত্রবান মহাজ্ঞানী ছিলেন। সারা জীবন তিনি ন্যায়ের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ করে গেছেন। অলীআল্লাহ নেককার বান্দাদের প্রতি তিনি আন্তরিকভাবে সহানুভূতিশীল ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) একজন সমাজসেবী দানশীলও ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। যা তার সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনা থেকে উপলব্ধি করা যায়।

আবু হানীফা (রঃ)-এর ফেকাহর বৈশিষ্ট্য ঃ আবু হানীফা (রঃ) প্রণীত ফেকাহর অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। এ সকল বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাঁর ফেকহী মাযহাব অধিকাংশ আলেম গ্রহণ করেছেন। এমনকি সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের দুই তৃতীয়াংশই মাযহাবে হানাফীর অনুসরণ করে আসছে বহু দিন পূর্ব থেকেই । নিম্নে এ সকল বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেয়া হলো।

১। ইমাম আবু হানীফা প্রণীত ফেকহী মাযহাব অত্যন্ত সহজ সরল যাতে অতি সহজেই কোন বিষয় বুঝা যায়।

www.pathagar.com

২। তাঁর ফেকহী মাসাআলাসমূহ তত্ত্ব তথ্য হিকমত ও কল্যাণ কারিতার উপর ভিত্তিশীল।

৩। ইমাম সাহেব মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কোরআনের দলীয়কে সর্বাগ্রে স্থান দান করেন।

৪। তাঁর ফিকাহাতে কিয়াস ও ইস্তেহসানের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়।

৫। লেনদেন, আচার আচরণ ইত্যাদি সকল দিকে সঙ্গতিরেখে হানাফী ফেকাহ রচিত হয়।

৬। হানাফী ফেকহর মাসাআলা অনুযায়ী যিম্মীকে স্বাধীনতা দেয়া হয়।

৭। ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুনের উপর ভিত্তি করে হানাফী ফেকাহ রচিত হয়েছে।

মৃত্যু ঃ ১৪৬ হিজরীতে মুসলিম এই জাতির কর্ণধার মহামনীষী ইমামকুল শিরোমণি ইমাম আযমকে খলীফা মানসুর কারাবন্দী করে। আব্বাসীয়দের বিরোধিতা তাঁর কারারুদ্ধ হওয়ার একমাত্র কারণ। কারাবন্দী হওয়ার পরে আবু হানফি (রঃ)-এর অসংখ্য ভক্ত শিষ্য ছাত্র জেলখানাতে সমবেত হতে থাকে। আবু হানীফা (রঃ)-ও সেখানে তাদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)ও আবু হানীফা (রঃ) কারাবন্দী থাকা অবস্থায় তাঁর থেকে শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম সাহেবকে কারাবন্দী করার পরে খলিফার বিরুদ্ধে জনআক্রোশ সৃষ্টি হতে আরম্ভ হয় এ সময় উপ্তৃত আন্দোলনে ভীত হয়ে গোপনে খাদ্যের সাথে ইমাম আবু হানীফাকে বিষ পান করায়। ফলে ইমাম আবু হানীফা কারাগারে নামাযে সেজদারত অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি অ-ইন্না

www.pathagar.com

ইলাইহ রাজেউন। ইমাম সাহেবের মৃত্যু সংবাদে সমগ্র বাগদাদে শোকের ঝড় বয়ে যেতে থাকে। গোসল করানো শেষ হবার সাথে সাথে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী ভক্ত হৃদয় তাঁর জানাযার নামাযে সমেবেত হয়। চার বার তাঁর জানাযার নামায পড়া হয়। তারপরেও লোকের ভিড় কমেনি। তিনি আসরের নামাযের সময় তাঁকে দাফন করার অসিয়ত করে যান এবং সে অসিয়ত অনুযায়ী তাঁকে আসরের সময় দাফন করা হয়।

আমীর খসরু

ভূমিকা ঃ ভারতিয় উপমহাদেশে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে যারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি নাম আমীর খসরু। তিনি একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ধারক বাহক ছিলেন তেমনি অন্যদিকে প্রসিদ্ধ কাব্যকারও ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট বলবন থেকে মুহাম্মদ তোঘলক পর্যন্ত দশ এগার জন বাদশাহর শাসন আমলে মহাপন্ডিত আমীর খসরু তাঁর অসাধারণ কাব্য ও সঙ্গীত দিয়ে সমগ্র ভারতের কৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করে যান।

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ ১২৫৩ খ্রীস্টব্দে আমীর খসরু হঠাহ জেলার পাতিয়ালি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। আমীর খসরু তুর্কীদের 'বচীন' গোত্র সম্ভূত ছিলেন। পূর্বপুরুষের আদি বাসস্থান ছিল

www.pathagar.com

বলখে। চেঙ্গিস খানের আক্রমণের পরে তাঁর পিতা বলখ হতে ভারতে চলে আসেন। ভারতে আসার পরে তাঁর পিতা সাইফুদ্দীন মাহমুদ শামসুদ্দীন আলতামাশের সভাসদ নিযুক্ত হন এবং নওয়াব এমদাদুল মুলকের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভেই আমীর খসরু জন্ম হয়।

শৈশব ও শিক্ষা জীবন ঃ শৈশবকালে আমীর খসরুর বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর পিতা সাইফুদ্দীন মাহমুদ মারা যান। এরপরে তিনি নানার তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হয়ে বড় হতে থাকেন এবং নানা তাঁর শিক্ষার জন্যে সম্ভাব্য সকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেন। তাঁর নানা নওয়াব এমদাদুল মুলক নিজে আমীর খসরুকে অনেক জ্ঞান শিক্ষা দান করেন। এরপর আমীর খসুরু বিশ বছর বয়সে আরবী ও ফার্সী ভাষায় বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। বাল্যকাল থেকেই আমীর খসরুর মধ্যে কাব্য প্রতিভা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া তিনি সঙ্গীতের প্রতিও বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন।

কর্মজীবন ঃ কর্মজীবনে আমীর খসরু অনেক বাদশাহর রাজ দরবারে বিভিন্ন বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সঙ্গীত ও কাব্যচর্চার বিশেষ সুযোগ অর্জন করেছিলেন। তাঁর খ্যতি সুনাম তৎকালীন সকল রাজা বাদশাহর নিকট পৌঁছেছিল। গিয়াস উদ্দীন বলবনের পুত্র শাহজাদা মুহাম্মদ আমীর খসরু সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। তাই তাঁর প্রিয় ভাজন ব্যক্তি হিসাবে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এক যুদ্ধে শত্রু পক্ষের হাতে আমীর খসরু বন্দী হন। সেখানে তিনি অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে দুটি বছর অতিবাহিত করেন। দুই বছর পরে তিনি মুক্তি পান।

www.pathagar.com

কাব্য ও সঙ্গীতচর্চা ঃ আমীর খসরু ফার্সী ভাষায় অতি উচ্চ মানের কবিতা রচনা করতেন। ফলে তৎকালীন ফার্সী কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্থান দখল করে নিয়েছিলেন। তিনি যে শুধু ফার্সী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এমনটি নয়; বরং উর্দু ভাষার উপরেও তাঁর বিশেষ দখল ছিল। তাই তিনি উর্দু ভাষায় অনেক সঙ্গীত, কাব্য ও গ্রন্থ বই রচনা করেন।

এসকল অসাধারণ রচনার কারণে তাঁকে উর্দু ভাষার জনক ও বলা হয়। এমনি করে ফার্সী ভাষায় কাব্য রচনার পাশাপাশি চারটি দেওয়ান ও অনেকগুলো মসনবী রচনা করেন। তৎকালীন ইরানের সমালোচকগণও এসকল রচনাবলীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। তাছাড়া আমীর খসরু সঙ্গীতের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ফার্সী ও ভারতীয় সঙ্গীত মিলিয়ে সংস্কারের মাধ্যমে নতুন ঢংয়ে সঙ্গীতের কাঠামো একেবারে বদলে দিয়েছিলেন। তাঁর সংস্কারকৃত সঙ্গীতের ধারা আজও চলছে। অনেকের মতে আমীর খসরুই সেতারার আবিষ্কারক। তাছাড়া তিনিই 'কাওয়ালির' জন্ম দান করেন। সঙ্গীতে তিনি যে সকল অবদান রেখে যান তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো।

১। তারানা।
২। কাওয়ালী।
৩। খেয়াল।
৪। নিগার।
৫। বাসীত।
৬। সাহানা।
৭। সহীলা।

সঙ্গীতে তাঁর অবদান আজও সকলের কাছে প্রিয় হয়ে আছে।

www.pathagar.com

ধর্মীয় জীবন ঃ আমী খসরু একদিকে যেমন কাব্যও সঙ্গীত চর্চার মাধ্যমে দেশব্যাপী সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করে জ্ঞান ও কৃষ্টির উচ্চাসনে আসীন হয়ে ছিলেন তেমনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের স্বর্ণ শিখরেও আরোহণ করলেন। তিনি তৎকালিন অলীয়ে কামেল বিশ্ববিখ্যাত দরবেশ হযরত নিজাম উদ্দীন আওলিয়ার পরম ভক্ত আদর্শবাদী মুরীদ ছিলেন। নিজাম উদ্দীন আওলীয়াও আমীর খসরুকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন।

মৃত্যু ঃ জ্ঞানে গুণে, কাব্যে, সঙ্গীতে, আধ্যাত্মিকতায় ও সুফীতত্ত্বে অতুলনীয় অপ্রতিদন্দ্বী এই মহান ব্যক্তি আমীর খসরু পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে অসংখ্য মূল্যবান অবদান রেখে ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রাণের মানুষ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ নিজামুদ্দীন আওলিয়ার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে ৭২ বছর বয়সে এ দুনিয়া ছেড়ে পরকালের উদ্দেশে কবর দেশে পা রাখেন। আমীর খসরুকে তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় শায়েখ আধ্যাত্মিক জগতের মুকটমণি হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়ার পাশেই দাফন করা হয়।

হযরত শাহ্‌জালাল ইয়ামেনী (রঃ)

ভূমিকা ঃ মোরশেদে কামেল, মোজাদ্দেদে যমান, হাদীয়ে মিল্লাত, কুতুবে রব্বানী, শ্রেষ্ঠতম ইসলাম প্রচারক হিসাবে যেই মহান দরবেশ সাহস মনোবল নিয়ে এ উপমহাদেশে আগমন করেছিলেন

www.pathagar.com

তিনি হলেন সকলের প্রিয় হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ)। ভারত উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার প্রসার শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ) এর অবদান চিরকাল ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে। তাঁরই অক্লান্ত সাধনায় আজ আমরা বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম করতে পেরেছি। অতএব, আমাদের কল্যাণে যে মহান ব্যক্তি এত অবদান রেখে গেছেন তাঁর জীবন ইতিহাস আমাদের জেনে নেয়া দরকার। নিম্নে তাঁর জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করা হলো।

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ মহান সাধক হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ) আরব দেশের ইয়ামেনে ১৩২২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব কালেই তাঁর পিতা মাতা মারা যান। এর পরে তিনি তাঁর মামা সৈয়দ আহমদ কবীর সাহবওয়ার্দীর তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত আদর যত্নে লালিত পালিত হয়ে বড় হতে থাকেন। মামার আদর যত্ন পেয়ে তিনি পিতা মাতার কথা ভুলে গিয়েছিলেন প্রায়। হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ) তাঁর মামার কাছে কোরআন হাদীস ফেকাহ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষা লাভ করার পরে তিনি ইসলাম প্রচার কাজে উপমহাদেশে আগমন করেন।

সিলেটে আগমন ঃ হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ) কোন্ সনে কত তারিখে যে সিলেট আগমন করেন তার সঠিক কোন তত্ত্ব তথ্য পাওয়া যায় না। ফলে তার সিলেট আগমনের তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেন। কতিপয় ঐতিহাসিকের মতে শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ) ১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সিলেট আগমন করেন আবার কারো মতে ৫৬১ হিজরী মোতাবেক ১১৬৬

www.pathagar.com

খ্রীষ্টাব্দে সিলেটে আগমন করেন। শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ)-এর সিলেট আগমনের তারিখ নিয়ে বিভিন্ন রকম মত থাকলেও তাঁর সম্পর্কে রচিত সবচেয়ে বেশী প্রামাণ্য গ্রন্থ "সুহেল ইয়ামেন" নামক কিতাবে দেখা যায়, তিনি ৭০৩ হিজরী মোতাবেক ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সিকান্দার খান গাযী নামক গৌড়ীয় সেনাপতির সাথে সিলেটে আগমন করেন।

সিলেট বিজয় ঃ হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ) সিলেট আগমনের প্রাক্কালে সিলেটের হিন্দু রাজা গৌড় গবিন্দ তথাকার মুষ্টিমেয় মুসলমানের উপর অমানুষিক নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছিল। বুরহানুদ্দীন নামে জনৈক মুসলমান তাঁর নবজাতক সন্তানের আকীকা উপলক্ষে গরু যবেহ করায় তাঁর উপর রাজা গৌড় গবিন্দ অমানুষিক অত্যচার চালায়। বুরহানুদ্দীন হিন্দু রাজা গৌড়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গৌড়ের মুসলিম সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াসের নিকট নালিশ করেন। তখন শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহকে গৌড় গোবিন্দকে দমন করার জন্যে যুদ্ধে পাঠান। কিন্তু সিকান্দার শাহ গৌড় গোবিন্দকে পরাজিত করতে পারলেন না। তখন দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাহায্য চাওয়া হয়। এদিকে নাসিরুদ্দীন নামক জনৈক দরবেশ ও তাঁর অনুচরগণ কর্তৃক গৌড় গোবিন্দর বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালিত হয়।

হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ) সিলেট মুসলমানদের উপর এই নির্যাতনের সংবাদ পেয়ে তাঁর অনুচর ও গৌড়ের সেনাপতি সেকান্দার খান গাযীকে সাথে নিয়ে ৭০৩ হিজরীতে এক অভিযান পরিচালনা করে সিলেট বিজয় করেন। শাহজালাল (রঃ) এবং তাঁর

www.pathagar.com

অনুচরদের নারায় তাকবীর আল্লাহু আকবার ধ্বানির ভয়ে গৌড় গোবিন্দ খিড়কি দরজা দিয়ে পালায়ন করেছিল। কোন যুদ্ধ ছাড়াই সিলেট বিজয় হওয়ার বিভিন্ন মত থাকলেও মূলত যুদ্ধের মাধ্যমেই সিলেট বিজয় হয়েছিল, যার প্রমাণ হিসাবে আজও সিলেটে হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর দরগাহে তাঁর তরবারি দেখতে পাওয়া যায়।

শাহজালাল (রঃ)-এর সিলেটী জীবন ঃ সিলেট বিজয়ের পর থেকে জীবনের বাকী ত্রিশ বছর তিনি সিলেটে ইসলাম প্রচার ও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে অতিবাহিত করেযান। তিনি যখন সিলেটে আগমন করেন তখন তাঁর সাথে ৩৬০ জন আওলিয়ার আগমন ঘটে। এদের এসকলকে শাহজালাল (রঃ) দ্বীন ইসলামের প্রচার প্রসার কাজে মনোনীত করে বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়েছেন। তাছাড়া আরো অসংখ্য ভক্ত মুরীদান শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ)-কে তাঁর দায়িত্ব পালন ও প্রচার কাজে বিভিন্ন দিক হতে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে। হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ) এবং তাঁর অনুচরগণের অক্লান্ত সাধনার ফলে সমগ্র সিলেট এক সময় মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হয় এবং আস্তে আস্তে সমগ্র দেশ ইসলামের প্রসার ঘটতে থাকে।

মুজাররদ ও ইয়ামেনী বলার কারণ ঃ হযরত শাহজালাল (রঃ) এর পুরোনাম হলো হযরত শাহ জালাল মুজাররাদ ইয়ামেনী। তাঁকে মুজাররদ বলার কারণ তিনি ছিলেন চিরকুমার আর মুজাররদ আরবী শব্দ, যার অর্থ মুক্ত, বিচ্ছিন্ন, যেহেতু তিনি বিবাহ বন্ধন হতে মুক্ত ও বিচ্ছিন্ন ছিলেন তাই তাঁকে মুজাররাদ বলা হয়। তিনি যেহেতু আরবের ইয়ামেন দেশে জন্ম গ্রহণ করেন সে কারণে তাঁকে ইয়ামেনী বলা হয়।

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচারে আগ্রহ ঃ হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ) ইসলাম প্রচারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ধার্মিক ন্যায় পরায়ণ সাহসী মুসলিম সৈনিক। ইসলাম প্রচার কাজে তাঁর আগ্রহ ছিল অতুলনীয়। যার কারণে সুদূর ইয়ামেন থেকে পায়ে হেঁটে এ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার করতে আসেন। কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট পথের দূরত্ব প্রতিবন্ধকতা তাঁর এই আগ্রহ রোধ করতে পারেনি। দ্বীন ইসলাম প্রচারে তাঁর এই আগ্রহে আরো অনেক ইয়ামেনী দরবেশ তার সাথী হয়ে সুদূর বাংলায় ইসলাম প্রচার করতে আসেন। গোটা জীবন এভাবে তিনি তাঁর অনেক ভক্ত মুরীদান নিয়ে ইসলাম প্রচারে অতিবাহিত করেন। যার প্রমাণ হিসাবে আজও তাঁর অনেক ভক্ত মুরীদানের মাজার শরীফ বাংলা পাক ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে লক্ষ করা যায়। তাঁর সঙ্গীদের অনেক বংশাধর আজও সিলেটের অধিবাসী হয়ে বসবাস করছে।

মৃত্যু ঃ হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ) জীবনের শেষ দিকে দিন রাত মহান আল্লাহর এবাদতে কাটিয়েছেন। লাখো মুসলমানের নয়ন মুকুট অলীয়ে কামেল হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ) অসংখ্য ভক্ত মুরীদানকে শোকসাগরে ভসিয়ে ১৩৮৪ খ্রীস্টাব্দে ৬২ বছর বয়সে ইহকাল ছেড়ে পরকালের পথের যাত্রী হন। আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি ১১৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের পরে সিলেটেই তাঁকে দাফন করা হয়। সেখানে আজও অসংখ্য মুরীদান তাঁর মাজার যিয়ারতে ভিড় করে থাকে। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতবাসী করুন। আমীন সুম্মা আমীন।

www.pathagar.com

ইমাম গাজালী (রঃ)

ভূমিকা ঃ মুসলিম মনীষীদের মধ্যে অন্যতম এক মহৎ ব্যক্তিত্ব সুফী দার্শনিক আল্লামা ইমাম গাজালী (রঃ) ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর দর্শন, প্রজ্ঞা ও সুগভীর জ্ঞান আজ বিশ্ববাসী সানন্দে তাদের জীবন চলার পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এমনকি পাশ্চাতের বড় বড় দার্শনিকরাও ইমাম গাজালী (রঃ)-এর বিচার বুদ্ধির পরিপক্বতা ও সুফীতত্ত্বে সুগভীর জ্ঞানে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি তাঁর সুগভীর দর্শন ও চিন্তাধারার আলোকে অনেক মূল্যবান বই পুস্তক রচনা করেন। এ সকল বই প্রকাশকাল থেকেই সকলের নিকট সমাদৃত হয়ে আসছে। ফলে তাঁর বইসমূহ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং সকল ভাষাভাষীর নিকটই সাদরে গৃহীত হয়ে আসছে।

জন্মস্থান ও জন্ম তারিখ ঃ বিখ্যাত সুফী দরবেশ অলীয়ে কামেল অন্যতম দার্শনিক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবীদ আল্লামা ইমাম গাজালী (রঃ) ১০৫৮ খ্রীষ্টাব্দে খোরাসান প্রদেশের তুস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মাদ আবু হামিদ আলগাজালী (রঃ)-তাঁর পিতার নাম ছিল মুহাম্মদ।

www.pathagar.com

শিক্ষা জীবন ঃ আধ্যাত্মিক জগতের প্রিয় মানুষ ইমাম গাজালী (রঃ) তাঁর জন্মস্থান তুস নগরেই প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এরপরে নিশাপুরে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই শিক্ষার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সাফল্য অর্জন করে নিজ এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। সর্বত্র তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার কথা ছড়িয়ে পড়ে।

কর্মজীবন ঃ লেখাপড়া শেষ করে ইমাম গাজালী (রঃ) সর্বপ্রথম ১০৯১ খ্রীষ্টাব্দে ৪৩ বছর বয়সে বিশ্ববিখ্যাত উজির নিজামুল মুলক প্রতিষ্ঠিত বাগদাদস্থ বিখ্যাত নিজামিয়া কলেজে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। অধ্যাপনার দায়িত্ব পাবার পর থেকে ইমাম গাজালী (রঃ) ঐ কলেজে শিক্ষাদানের ফাঁকে ফাঁকে সকলকে দ্বীনী উপদেশ প্রদান, দ্বীন সম্বন্ধে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং সে সমস্যার সঠিক সমাধানও দিতেন। এভাবে নিজামিয়া কলেজে একাধারে চার বছর অধ্যাপনা করার পর তিনি নিজ হৃদয়ে দ্বীনের সঠিক জ্ঞানের একটা শূন্যতা অনুভব করলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন শুধুমাত্র জ্ঞান ও দর্শণ দ্বীনের সঠিক সন্ধান দিতে পারে না। বরং আত্মিক জ্ঞান অর্জন আত্মিক তৃপ্তির মাধ্যমেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এ সকল কথা চিন্তা করে ইমাম গাজালী (রঃ) অনতিকাল বিলম্বে নিজামীয়া কলেজের অধ্যাপনার দায়িত্ব হতে অবসর গ্রহণ করেন।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনে সাধনা ঃ ইমাম গাজালী (রঃ) বাগদাদের নিজামিয়া কলেজের অধ্যাপনায় ইস্তেফা দিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন। এ সময় পরিবার পরিজনের সংস্পর্শ সম্পূর্ণ রূপে ছিন্ন

www.pathagar.com

করে অত্যন্ত কঠোরভাবে দ্বীনী জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হন এবং সব সময় খ্যাতনামা সুফীসাধক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে অগ্রগামী লোকদের সংস্পর্শে থাকতে শুরু করেন। তাঁদের সংস্পর্শে এসে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন। ইমাম গাজালীর মনে এই ভাব উদয় হয় যে, তর্ক করে সব সময় সত্য ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা যায় না। বরং আধ্যাত্মিক জ্ঞানই আসল জ্ঞান। তৎকালীন সুফী সাধকদের সংস্পর্শে থাকাকালীন ইমাম গাজালী (রঃ) দার্শনিকদের জন্যে "তাহাযাতুল ফালসাফা" নামে একখানা বই রচনা করেন। এই বইয়ের মধ্যে তিনি অত্যান্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে কঠোরভাবে তৎকালীন প্রচলিত অধিবিদ্যা মতবাদ প্রত্যাক্ষান করেন। তাছাড়া তিনি তার বইখানিতে দার্শনিক মতবাদকে নিছক অজ্ঞতা বলে অভিহিত করেন।

সত্যের সন্ধানে দেশ ভ্রমণ ঃ স্থানীয় সুফীগণের সংস্পর্শে থেকে আধ্যত্মিক জ্ঞান সম্পর্কে অনেক কিছু জানার পর ইমাম গাজালি (রঃ) সত্যের সন্ধান এবং দেশ বিদেশের খ্যাতনামা সুফী সাধকদের সান্নিধ্য লাভ করার জন্যে দেশ বিদেশে ঘুরতে শুরু করেন। সত্যের সন্ধানে তিনি সিরিয়ার রাজধানী দামেশেক যান, তাছাড়া পবিত্র মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ, জেরুজালেম জারুন এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।এসব এলাকার বিভিন্ন সুফী সাধকের সান্নিধ্য লাভ করে তাঁদের থেকে অনেক সুফীতত্ত্বও তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সত্যের দিশা খুজতে থাকেন। এভাবে তিনি সত্যের সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করে চলছিলেন এক সময় সুলতান মালিক শাহ ইমাম গাজালীকে করজোর অনুরোধ করে নিশাপুরস্থ বিখ্যাত নিজামুল মুলকের কলেজে পুনরায় অধ্যাপকের দায়িত্ব প্রদান করেন। এরপর সেখানে সুনাম সুখ্যাতি

www.pathagar.com

নিয়ে অধ্যাপনার কাজ চালিয়ে যান এবং অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে অনেক মূল্যবান বই পুস্তক লেখতে থাকেন।

ইমাম গাজালীর রচনাবলী ঃ ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এমন একজন মনীষী ছিলেন, যিনি একদিকে যেমন নিজে অনেক পান্ডিত্য ও সুফীবাদের জ্ঞান অর্জন করেন তেমনি তিনি তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে রচনা করে গেছেন অনেক মূল্যবান গ্রন্থ তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা সর্বমোট ৬৯। দার্শনিক মতবাদের অজ্ঞানতা, সুফীবাদের মৌলিক তত্ত্বও ঈমান আমল ও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তিনি তাঁর এ সকল গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম নিম্নে দেয়া হল ঃ

১। কিমিয়ারে-সাআদাত।
২। হেদায়াতুল বিদায়া।
৩। আলদ্দুরাতুল ফাখরা।
৪। মিনানুল আমাল।
৫। মাকসাদুল ফালসাফা।
৬। তাহাফাতুল ফালসাফা।
৭। এহইয়াউ উলুমুদ্দীন।

ইমান গাজালীর রচিত উনসত্তর খানা গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ হলো এহইয়াউ উলুমুদ্দীন বিশ্ব মুসলিম মনীষীদের নিকট সানন্দে গৃহীত হয়েছে এবং সকলেই এর থেকে লাভবান হয়েছেন। কারণ এতে ইমাম গাজালী (রঃ) জ্ঞানের বিভিন্ন দিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা ও সুফীতত্ত্বের সর্বপর্যায়ে ধর্ম ও নীতি শাস্ত্র নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

www.pathagar.com

মৃত্যু ঃ নিশাপুর কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেয়ার সামান্য কিছু দিন পরে ইমাম গাজালী (রঃ) নিজ বাড়ী তুসনগরে ফিরে আসেন। বাড়ীতে ফিরে আসার কিছু দিন পরে এই বিখ্যাত সুফী সাধক মুসলিম মনীষী তাঁর অসংখ্য ভক্ত হৃদয়কে ব্যাকুল করে ১১১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মাত্র ৫৩ বছর বয়সে মহান আল্লাহ তাআলার ডাকে সাড়া দিয়ে পরকালের পথে যাত্রা করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কবরকে নুরের আলোয় আলোকিত করুন এবং জান্নাতকে তাঁর আবাস স্থল করে দিন আমীন।

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ)

ভূমিকা ঃ সুফী সাধকগণের মধ্যে যিনি প্রথম স্থান দখল করে নিয়েছেন, তিনি হলেন অলীয়ে কামেল, মাহবুবে সোবহানী কুতুবে রব্বানী গাউসুল আযম শায়খ সৈয়দ মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-তিনি বড় পীর নামে খ্যাতি অর্জন করেন। বিশ্ব মুসলিম হৃদয়ে তিনি যেমন স্থান দখল করে আছেন অন্য কোন অলীআল্লাহ পীর মাশায়েখ তাঁর সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেন নি। বিশ্বব্যাপী তাঁর অসংখ্য ভক্ত রয়েছে, তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরম শিখরে পৌঁছেছিলেন। তাই এই মহান সুফী সাধকের জীবনআদর্শ হতে কিছু শিখে নেয়া দরকার। সে জন্যেই নিম্নে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করা হলো।

www.pathagar.com

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ বড় পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দ মোতাবেক ৪৭০ হিজরীর ১লা রমযান পারস্যের জিলান প্রদেশে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত এক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সাইয়্যেদ আবু সালেহ মূসাঙ্গী এবং মাতার নাম ছিল সাইয়্যেদাহ উম্মুল খায়র ফাতেমা। বড়পীর সাহেব মাতা পিতা উভয় দিক হতেই হযরত রাসূলে পাক (সঃ)-এর বংশধর। জিলান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করার কারণে তাঁর নামের সাথে জিলানী সংযুক্ত হয়। শৈশবকালেই বড় পীর সাহেব পিতার আদর যত্ন, স্নেহ ভালবাসা ও রক্ষণা বেক্ষণ হতে বঞ্চিত হন।

শিক্ষাজীবন ঃ আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) তাঁর মা সাইয়্যেদা উম্মুল খায়র ফাতেমার নিকট বাল্য শিক্ষা লাভ করেন। কথিত আছে, আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) জন্ম থেকেই ১৮ পারা কোরআনের হাফেজ ছিলেন। বড় পীর সাহেবের বয়স যখন ১৮ বছর তখন তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে বাগদাদে যান এবং সেখানে নিজমিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে কোরআন, হাদীস, তাফসীর ফেকহা, মানতিক, তাসাউফ ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি শায়খ তিরমিযী (রঃ)-এর নিকট হতে ভাষাতত্ত্ব জ্ঞান শায়খ আহমদ (রঃ)-এর নিকট হতে ফেকহী বিদ্যা এবং আবুল খায়র আদদাব্বাশের নিকট হতে তাসাউফের বিদ্যা অর্জন করেন।

কর্মজীবন ঃ বড় পীর আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) বাগদাদে উচ্চ শিক্ষা সমাপনান্তে কোরআনের তাফসীর হাদীস ও ধর্মীয় অন্যান্য শিক্ষাদানের নিমিত্তে এর মাযহাবে হাম্বলী একজন সুবিখ্যাত পন্ডিত হিসাবে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ পন্ডিত, বিখ্যাত বাগ্মী মহা পুরুষ। তাছাড়া তিনি অসাধারণ শক্তিশালী সুফী ও সাধক ছিলেন। ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে হযরত আবু সায়ীদ মাখযুযী তাঁর মাদ্রাসার দায়িত্ব বড় পীর সাহেবের হাতে অর্পণ করেন। এমনি করে ১১৩৪ সালে বড় পীর সাহেব ঐ মাদ্রাসার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সুদীর্ঘ ৩৩ বছর এ মাদ্রাসায়ই অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন।

আধ্যাত্মিক সাধনা ঃ বড় পীর সাহেব পড়াশোনা ও অধ্যাপনার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্রতী ছিলেন। তিনি সুফীবাদের শিক্ষানুযায়ী কঠোর নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন করেন এবং তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেকে একজন সুফী সাধক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কিছু দিন ধরে অত্যন্ত কঠিন নিয়ম-কানুনের মধ্যে জীবন পরিচালনা করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার বর্ণনা জনৈক মনীষী বলেন, বড় পীর আবদুল কাদির জিলানীর সাথে তাঁর হুজরায় একবার আমার রাত যাপনের সৌভাগ্য হয়। তখন দেখলাম, তিনি সারা রাত নফল নামায এবং মোরাকাবা মোশাহাদার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন। তখন তাঁর মধ্যে যেন এক স্বর্গীয় নূরের দীপ্তি ঝলমল করছিল। যেই নূরের দীপ্তির দিকে চোখ মেলে তাকানো ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। আবদুল কাদির জিলানী (রঃ)-এর আধ্যাত্মিক সাধনার দিনগুলো এভাবেই অতিবাহিত হয়। তাঁর তরীকাই কাদেরিয়া তরীকা নামে পরিচিত।

চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) ছিলেন এক সুন্দর নির্মল প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী মহৎ ব্যক্তি। সাধুতা, সত্যবাদিতা, অলৌকিক শক্তি ও প্রগাঢ় জ্ঞান তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ ছিল।

www.pathagar.com

বাল্য বয়স হতেই তাঁর থেকে অসংখ্য কারামত প্রকাশ পায়! তিনি সত্যবাদীতার বিরল প্রতীক ছিলেন, যা প্রমাণিত হয়েছিল বাগদাদের পথে দস্যু দলের সাক্ষাতে জামার আস্তিনে মায়ের সেলাই করে দেয়া স্বর্ণ মুদ্রার কথা দস্যু নেতাকে বলার মাধ্যমে। তিনি জানতেন। স্বর্ণ মুদ্রার কথা ডাকাতদের বলে দিলে নিয়ে যাবে। তথাপি তিনি মায়ের আদেশ "কখনো মিথ্যা বলবে না" রক্ষাকল্পে এই বিপদ সংকুল মুহূর্তেও গোপন করেননি। তাঁর হাতে অসংখ্য ইয়াহুদী খৃষ্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। বাল্যকাল হতে তিনি সৎ, সাহসী ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি এত ধার্মিক ছিলেন যে, তিনি ১লা রমযান জন্ম নেয়ার পরে সারা রমযানে দিনের বেলা কখনো মায়ের বুকের দুধ পান না করে রোযা রাখতেন। শিশু বয়সেই তাঁর মধ্যে এরূপ ধার্মিকতা লক্ষ্য করা যায়।

অনেক ধন সম্পদের মালিক থাকা সত্ত্বেও কখনো তিনি আরাম আয়েশ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যর দিকে পা বাড়াননি। সমস্ত পীর মাশায়েখ অলী আল্লাহ বুযুর্গানে দ্বীন একবাক্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চাসন স্বীকার করে নিয়েছেন।

রচনাবলী ঃ তিনি লেখাপড়া, অধ্যাপনা ও আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে যান, সেসব গ্রন্থ পড়ে মুসলিম জাতি আজও তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। এসবের মধ্য হতে কতিপয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো।

১। গুনিয়াতুত তালেবীন।
২। আলফাতহুর রব্বানী।
৩। ফতুহুল গায়েব।
৪। যুলখাতীর।

www.pathagar.com

৫। কসীদাতুল গাউসিয়া।
৬। রহমাতুল আসরার।
৭। ফার্সী দেওয়ান।
৮। আলযাওদাতুর রব্বানিয়া।

রাসূল (সঃ) পর্যন্ত কাদেরিয়া তরীকার ধারাবাহিকতা ঃ তরীকার ধারাবাহিকতায় আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) রাসূল (সঃ) হতে নিম্ন দিকে সতর নম্বরে ছিলেন। নিম্নে এই ধারাবাহিকতা দেয়া হলো।

১। হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা আহম্মদ মোজতবা (সঃ)
২। আলী ইবনে আবী তালেব (রঃ)
৩। ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (রঃ)
৪। ইমাম যয়নুল আবেদীন ইবনে হুসাইন (রঃ)
৫। শায়খ ইমাম বাকের (রঃ)
৬। ইমাম জাফর সাদেক (রঃ)
৭। শায়খুল মাশায়েখ মূসা কাযেম (রঃ)
৮। ইমাম আলী রেযা (রঃ)
৯। শায়খ মারুফ আলকারখী (রঃ)
১০। আবুল হুসাইন আস্‌সিররী সাকতী।
১১। ইমাম জুনাইদ বোগদাদী।
১২। হযরত আবু বকর আশশিবলী।
১৩। আবদুল আযীয বিন হারিস।
১৪। আবদুল ওয়াহেদ তামিসী।
১৫। আবুল হাসান কোরাইশী।
১৬। আবু সাঈদ মোবারক মাখযুমী।

www.pathagar.com

১৭। শায়খুল মাশায়েখ কুতুবুল আরেফীন সইয়্যেদুল মোআহহেদীন গাউসুল আযম মুহিউদ্দীন হযরত শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) ইমামুত তরীকা ওয়াল আউলিয়ায়ল কামেলীন।

মৃত্যু ঃ মুসলিম সুফী সাধকদের, নয়নমণি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কান্ডারী ১১৬৬ খ্রীস্টাব্দে বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ইনতেকাল করেন।মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বড় পুত্রকে ডেকে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা এবং নেক আমল করার উপদেশ দিয়ে কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করতে করতে হাজার হাজার ভক্ত মুরীদানদের মনের মুকুরে শোকের আগুন জ্বালিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে মহান আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য লাভে পরকালের পথে যাত্রা করেন। বাগদাদে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর কবরকে নূরের আলোয় আলোকিত করুন এবং জান্নাতকে তাঁর গন্তব্যস্থল নির্ধারণ করুন। আমীন।

হযরত শাহ পরান (রঃ)

ভূমিকা ঃ উপমহাদেশের প্রখ্যাত মোরশেদে কামেল হাদিয়ে যমান, কুতুবে রব্বানী অলীকুল শিরোমণী হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ) এর আপন ভাগ্নে হযরত শাহ পরান (রঃ) উপমহাদেশের প্রত্যেকটি সুফী সাধকের হৃদয়ে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। মামা শাহজালাল ইয়ামেনীর সাথে তিনি এ উপমহাদেশে আগমন করে

www.pathagar.com

দ্বীন ইসলামের প্রচার প্রসার কাজে গোটা জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁদের অক্লান্ত সাধনায় আজ বাংলাদেশ একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান দখল করেছে, হযরত শাহ পরান (রঃ) তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

সিলেটে আগমন ঃ ৭০৩ মতান্তরে ৫৬১ হিজরী সালে হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ) যখন সিলেট আগমন করেন তখন শাহ পরান (রঃ) ও সিলেটে আসেন। মামার সংস্পর্শে তিনি আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলেন এবং দ্বীন ইসলাম প্রচারে মামাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করতে থাকেন।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ ঃ "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ" হযরত শাহ পরান (রঃ)-এর জীবন সৎ সঙ্গে স্বর্গবাসের গঠিত হয়েছিল। তিনি তাঁর মামা হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ)-আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। এবং মামার হাতে বয়াত গ্রহণ করে নিজেকে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত করেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনায় তিনি এত একাগ্র চিত্তের অধিকারী ছিলেন যে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর মামা শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ)-এর যত মুরীদ ছিল তাঁদের সকলের উপরে নিজের আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। অনেক সময় দেখা যায়, ছাত্র ওস্তাদকে জ্ঞানের জগতে অনেক উর্দ্ধে চলে যায়। হযরত শাহ পরান (রঃ) এমনি একজন ছাত্র। তিনি এক সময় আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ ও মামা হযরত শাহ জালাল ইয়ামেনীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে হার মানিয়ে দিয়েছিলেন প্রায়।

www.pathagar.com

শাহ্ পরান (রঃ)-এর একটি কারামত ঃ হযরত শাহ পরান (রঃ) যখন তাঁর মামার সাথে দিল্লী হতে সিলেটে এসেছিলেন তখন খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া তাঁর মামাকে একজোড়া কবুতর হাদিয়া দিয়েছিলেন। এ কবুতর জোড়া তাঁর মামা সিলেটে নিয়ে আসেন। কবুতর জোড়া খুব আদর যত্নে পালতে থাকলেন এবং কবুতরের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু অনেক দিন পর শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ) লক্ষ্য করলেন যে অনেক কবুতরের বাচ্চা জন্মানো সত্যে কেন যেন কবুতরের সংখ্যা আশানুরূপে বাড়ছে না। তখন এর কারণ সম্পর্কে শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ) তাঁর মুরীদগণকে জিজ্ঞাসা করেন। তখন জনৈক মুরীদ বলে দিল। হুজুর আপনার প্রিয় ভাগ্নে শাহ পরান (রঃ) প্রতিদিন একটি করে কবুতরের বাচ্চা জবাই করে খেয়ে থাকেন, এজন্যে কবুতরের সংখ্যা আশানুরূপ বাড়ছে না। মামা শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ) ভাগ্নের সম্পর্কে এ কথা শুনে রেগে গিয়ে ভাগ্নে শাহ পরানকে তাঁর সামনে ডেকে আনার হুকুম দিলেন।

একজন শাহ পরান (রঃ)-কে ডেকে আনার জন্যে চলে গেলেন। প্রেরিত একটু দাঁড়াতে বলে ভিতরে গিয়ে জবাই করা কবুতরের বাচ্চাগুলোর পালক গুলো তার সামনে নিয়ে এসে বাতাসের সাথে উড়িয়ে দিলেন। অলৌকিক ভাবে এক একটি পালক এক একটি কবুতর হয়ে উড়ে গেল। শাহ পরানের এই অলৌকিক ঘটনা দেখে লোকটি ভয়ানক অবাক হয়ে গেলেন এবং তৎক্ষনা শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ)-এর নিকট এসে সব ঘটনা খুলে বলেন। এরপরে মামা হযরত শাহ জালাল (রঃ) ভাগ্নে শাহ পরানকে এক নিভৃত স্থানে ডেকে বললেন, দেখ ভাগ্নে এখন তুমি আধ্যাত্মিকতার যে স্তরে

www.pathagar.com

উপনীত হয়েছ তাতে তোমার এখানে বসে থাকা ঠিক হবে না। অতএব তুমি এক জায়গায় একটি আস্তানা গড়ে সেখানে দ্বীন ইসলামের প্রচার প্রসার কাজ চালিয়ে যাও এবং মানুষকে সত্যের পথে আহবান করতে থাক। তোমার যে যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে তাতে তুমি এ কাজ করতে পারবে।

মৃত্যু ঃ মামা শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ)-এর অনুমতি পেয়ে হযরত শাহপরান (রঃ) সিলেট শহর এলাকা হতে ৫/৬ মাইল দূরে "খাদিম" নগরে গিয়ে একটি আস্তানা গড়েন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ জায়গায় থেকে মানুষকে ইসলামের পথে দাওয়াত দিয়ে গেছেন। খাদিকম নগরে যাওয়ার পর হতে বাকী জীবনটুকু তিনি দ্বীনের পথে বিলীন করে দিয়েছিলেন।

মৃত্যুর পরে হযরত শাহ পরান (রঃ) কে এই " খাদিকম " নগরেই ছোট্ট একটি পাহাড়ের উপরে দাফন করা হয়। তাঁর মাজারে একটি নিমগাছ ও আমগাছ আজও অতীতের সেই স্মৃতি জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। হযরত শাহ পরান (রঃ) এর অনেক অলৌকিক কারামতের ঘটনা শুনতে পাওয়া যায়। এ সকল কারামত সকল কে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল এবং অনেক মানুষই তাঁর কারামত দেখে ইসলাম গ্রহণ করে এবং আধ্যাত্মিকতার পথে এগিয়ে আসে।

www.pathagar.com

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)

ভূমিকা ঃ যে সকল মহান ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে বঙ্গ ভারতে সোনালী ইসলামের নির্মল আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের মধ্যে সুফী সম্রাট হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর পবিত্র নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। বঙ্গ ভারতে ইসলাম প্রচারে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী যে অবদান রেখে গেছেন তা ইতিহাসের পাতায় চির ভাস্কর হয়ে থাকবে। কেননা বঙ্গ ভারতের পথহারা পথভোলা মানব জাতি তাঁর মাধ্যমেই সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে। তাঁর পবিত্র হাতে অসংখ্য মুসলমান অমুসলমান বায়আত গ্রহণ করে সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে নিজেদের জীবন ধন্য করেছেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ সত্যের দিশারী হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী ঐতিহাসিক সিস্তানের সনজর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তবে পিতার নাম ছিল খাজা গিয়াসুদ্দীন, তিনি আবেদ ও বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জীবনের চাওয়া পাওয়াই ছিল আল্লাহ রাসূলের রেজামন্দি। তাঁর মাতার নাম সৈয়দা উম্মুল ওয়ারা। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিক দিয়েই সৈয়দ বংশ সম্ভুত ছিলেন। এছাড়া তিনি উভয় দিক দিয়েই সত্যের [illegible] আলী কাররামাল্লাহ

www.pathagar.com

ওয়াজহাহু এবং নারী সম্রাট হযরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ)-এর বংশধর ছিলেন। হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)- এর বংশের ক্রমধারা নিম্নে দেয়া হল।

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর পিতৃকুল

হযরত আলী কাররামাল্লাহা ওয়াজহাহু
হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ)
হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রঃ)
হযরত ইমাম বাকের (রঃ)
হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রঃ)
হযরত ইমাম সৈয়দ মূসা কাজেম (রঃ)
হযরত ইমাম মূসা আলী রেজা (রঃ)
হযরত ইমাম সৈয়দ ইব্রাহীম (রঃ)
হযরত ইমাম সৈয়দ আবদুল আজিজ (রঃ)
হযরত ইমাম সৈয়দ তাহের (রঃ)
হযরত ইমাম সৈয়দ আহমদ হুসাইন (রঃ)
হযরত ইমাম সৈয়দ কামাল উদ্দিন (রঃ)
হযরত ইমাম সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন আহমদ (রঃ)
হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর মাতৃকুল

হযরত আলী কাররামাল্লাহা ওয়াজহু
হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)
হযরত ইমাম হাসান মুসান্না (রঃ)
হযরত ইমাম আবদুল্লাহ মোহজ (রঃ)
হযরত ইমাম মূসা (রঃ)
হযরত ইমাম দাউদ (রঃ)

www.pathagar.com

হযরত ইমাম মুহাম্মদ মুরস (রঃ)
হযরত ইমাম ইয়াহইয়া জাহেদ (রঃ)
হযরত ইমাম আবদুল্লাহ হাম্বলী (রঃ)
হযরত ইমাম দাউদ (রঃ)
হযরত সৈয়দা উম্মুল ওয়ারা (রঃ)
হযরত ইমাম খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর বাল্যকাল ঃ

সত্যের দিশারী হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর বয়স যখন দশ বৎসর তখন তাঁর পিতা সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন আহমদ ঐতিহাসিক খোরাসানে আগমন করেন। খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর বাল্যকাল বহু কষ্ট ক্লেশের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। তিনি অস্বান্তিকর পরিবেশের মধ্যে বড় হন। যে পরিবেশের মধ্যে হরহামেশা খুন জখম, লুটতরাজ ইত্যাদি। লেগেই থাকত যার কারণে হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) বাল্যকালে মনের দিক থেকে খুবই দুর্বল ছিলেন।

অশান্ত পরিবেশের মধ্যে বাল্যকাল অতিবাহিত হওয়ায় তাঁর কিশোর মনে সংসারের প্রতি একটা অনীহা সৃষ্টি হয়ে পর্যায়ক্রমে বৈরাগ্য ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল।

তবে অশান্ত পরিবেশের মধ্যে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী বাল্যকাল অতিবাহিত হলেও তিনি অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। একথা সর্বজন বিদিত যে, বাল্য বয়সে মানুষ একটু আড্ডাপ্রিয় হয়, কিন্তু খাজা মঈনুদ্দিন (রঃ) কোন সময়ই বাল্যকালে সমবয়সী বন্ধু বান্ধবদের সাথে খোশ গল্পে বসতেন না। এমন কি বাজে ছেলেমেয়েদের সাথে খেলাধুলা করতে যেতেন না। তার জীবনের শুরু

www.pathagar.com

থেকে শেষ পর্যন্ত কারো সাথেই কথা কাটাকাটি ও মনোমালিন্য হয়নি; বরং তিনি তার বন্ধু বান্ধবদের ঝগড়া বিবাদ, মিটিয়ে দিতেন। এক কথায় তৎকালে খাজা মঈনুদ্দীন পাড়াপড়শি সকলের কাছেই অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন। খাজা মঈনুদ্দী সাত বৎসর বয়স থেকে পিতার নিকট কোরাআন শরীফ পড়তে আরম্ভ করেন। এবং তখন থেকেই নামায রোযা পালন করতে থাকেন। খাজা মঈনুদ্দীন প্রত্যহ সকালে বিকালে পিতার নিকট লেখাপড়া শিক্ষা করতেন, আর জীবিকা নির্বাহের জন্য সমস্ত দিন পিতার সাথে বাগানে কাজ করতেন। আবার বাজার হতে নিজেদের সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে বয়ে আনতেন।

খাজা মঈনুদ্দীন এত কষ্ট ক্লেশের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করলেও তাঁর মুখে সর্বদা হাসি থাকত। কারও সঙ্গে দেখা হলেই মুচকি হাসি দিয়ে কথা বলতেন। যাই হোক খাজা মঈনুদ্দীন, বাল্যকাল ছিল খুবই কষ্টের, যা শুনলে প্রত্যেকেরই মন কেঁদে উঠবে। তবে আল্লাহ তাআলার মহিমা বুঝার ক্ষমতা কার নেই। একথা বাস্তব সত্য যে, বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন কোন মুসলিমকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁকে অনেক দুঃখ দৈন্য ও বিপদাপদের ভিতর দিয়ে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর পথে আসতে হয়। খাজা মঈনুদ্দীন (রঃ)-এর বয়স যখন মাত্র দশ বৎসর তখন তাঁর পিতামাতা দুনিয়া হতে বিদায় নেন।

খাজা মঈনুদ্দীন (রঃ)-এর শিক্ষা ঃ বর্তমান যুগের মত সেকালে অনেক দেশে লেখাপড়া করার তেমন প্রতিষ্ঠান ছিল না। যার কারনেই যারা লেখাপড়া করতে আগ্রহী ছিল তারা প্রত্যেকেই মাতৃভূমি ত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি জমাতেন। তদ্রূপ খাজা মঈনুদ্দী নিজের

www.pathagar.com

জীবন যাপনের একমাত্র সম্বল বাগানখানা বিক্রয় করে সম্পূর্ণ মূল্যটা নিয়ে লেখাপড়া শিক্ষার উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক বোখারা শহরে এসে হাজির হন। তৎকালে সমরকন্দ ও বোখারা ছিল ইসলামী বিখ্যাত শিক্ষা কেন্দ্র সেখানেই খাজা মঈনুদ্দীন তথায় অল্প দিনের মধ্যে কোরআন, হাদীস, ফিকাহ, উসুল ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন।

খাজা ওসমান হারূনীর (রঃ)-এর নিকট বায়আত গ্রহণ ঃ খাজা মঈনুদ্দীন যাহেরী বিদ্যা শেষ করে আধ্যাত্মিক জগতের শেষ প্রান্তে পৌছার মানসে ঐতিহাসিক নিশাপুরে খাজা উসমান হারূনীর কাছে গিয়ে হাজির হন। ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায়, ।হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) এই ধার্মিক ব্যক্তির সাহচর্য একটানা বিশ বছর কাটিয়ে দেন। তথায় তাঁর সাথে বহু বিখ্যাত বুজর্গের সাক্ষাত হয়। পরবর্তী কালে যহরত খাজা ওসমান হারূনীর কাছ থেকে বিদায় হয়ে তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য ভারতে আসেন।

আজমীর গমন ঃ রূহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী তাঁর প্রাণপ্রিয় মুরীদ খাজা কুতুবুদ্দীনকে দিল্লীতে রেখে আজমীরের দিকে রওয়ানা হন। তিনি আজমীরে যেখানে নিজ আবাস স্থাপন করলেন তা ছিল হিন্দু রাজার উট চারণ ভূমি। খাজা মঈনুদ্দীনকে দেখে রাখালগণ বিরক্ত হয়, শুধু বিরক্ত নয়, সেখান হতে তাঁকে চলে যাওয়ার জন্য বলেন। প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ একটু ভেবে দেখুন, খাজা মঈনুদ্দীন আল্লাহর কত উচ্চ পর্যায়ের প্রিয় বান্দা ছিলেন। বিকেল বেলা রাখাল উটগুলো যথাস্থানে রেখে বাড়ীতে চলে যায়। পর দিন সকালে রাখালরা এসে দেখতে পেল উটের চামড়া মাটির সাথে যুক্ত হয়ে আছে। এহেন পরিস্থিতি দেখে তারা চমকে উঠে

www.pathagar.com

শুধু চমকেই উঠলনা অগত্যা রাখাল খাজা মঈনুদ্দীন (রঃ)-এর পদপ্রান্তে পড়ে অনুনয় বিনয় করে মাফ চাইল। মাফ চাইবার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার অসীম রহমতে উঠগুলো যথাস্থানে দাঁড়ানো দেখতে পেল, মুহূর্তের মধ্যে এই অলৌকিক ঘটনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় বহু হিন্দু তার কাছে মুসলমান হয়।

আনা সাগরের তীরবর্তী মন্দির ঃ সত্যের সৈনিক হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী ঐতিহাসিক আনা সাগর তীরবর্তী ঝর্ণার নিকট ইসলাম প্রচারের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে আস্তানা স্থাপন করেন। আনা সাগরের দুই তীরে বহু সংখ্যক মন্দির বিদ্যমান ছিল। এ মন্দিরে দেশের আনাচে কানাচ হতে লোকজন এসে পূজা করত। এমন কি রাজপরিষদের লোকজন এসেও মন্দিরে পূজা করত। মন্দিরে প্রতিদিন এত লোকজন আসত যার কারণে প্রতিদিন তিন মন তেল খরচ হত। বহু দিন ধরে এ মন্দিরে পূজা চলতে থাকে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় পূজারীরা মধুমাখা আজানের সুললিত ধ্বনি শুনে অবাক হয়ে গেল। আজানের ধ্বনি শুনে পূজারীরা রাজদরবারে গিয়ে অভিযোগ করল। অভিযোগ শুনে রাজা রাগান্বিত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে একদল সিপাহী প্রেরণ করলেন। রাজার আদেশ পেয়ে সিপাহী দল খাজা মঈনুদ্দীনের উপর ক্ষেপে গেল। তারা আক্রোশ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হল না; বরং খাজা মঈনুদ্দীনকে তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হল। রাজকীয় সৈন্যবাহিনী খাজা মঈনুদ্দীনকে বিভিন্নভাবে গালিগালাজ করলেও সেদিকে মোটেই খেয়াল দিলেন না বরং নরম স্বরে বললেন তোমরা কি চাও? তোমরা আর বাড়াবাড়ি করোনা তাহলে তোমাদের উপর আল্লাহর গজব বর্ষিত হবে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় রাজকীয় বাহিনী খাজা মঈনুদ্দীনের আদেশ অমান্য করে সামনে অগ্রসর হতে

www.pathagar.com

লাগল। এমনি সময় রূহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা হযরত খাজা মঈনুদ্দীন তাদের দিকে এক মুষ্টি ধূলি নিক্ষেপ করলেন। ধূলি নিক্ষেপ করা মাত্রই রাজকীয় সৈন্য বাহিনী চিৎকার দিয়ে দৌড়াতে লাগল। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কেউ অন্ধ কেউ বধির কেউ খঞ্জ আর কেউ মাতাল হয়ে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে এ অলৌকিক ঘটনা রাজার কাছে পৌছল। এ ঘটনা হতেই অনুধাবন করা যেতে পারে, খাজা মঈনুদ্দীন কত উচ্চ পর্যায়ের আল্লাহর ওলী ছিলেন।

রামদেব ও অজয় পালের ইসলাম গ্রহণ ঃ পৃথ্বীরাজ মনে মনে ভাবছিলেন খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী একজন নামকরা জাদুকর। এসব চিন্তা ভাবনা করে সেসময়ের নামকরা জাদুকর রামদেব ও অজয় পালকে হযরত খাজা মঈনুদ্দীনের নিকট তার অবস্থা জানার জন্য পাঠান। তারা যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হয় তখন খাজা মঈনুদ্দীন আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, তাদের আগমনে খাজা মঈনুদ্দীনের ধ্যান ভেঙ্গে গেল। খাজা মঈনুদ্দীনকে দেখা মাত্রই রামদেব ও অজয় পালের হৃদয়ে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। মুহূর্তের মধ্যে তারা খাজা মঈনুদ্দীনের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়। ইসলামে দীক্ষিত হবার পর খাজা মঈনুদ্দীন তাদের নাম রাখেন মুহাম্মদ সাদী ও আবদুল্লাহ।

পৃথ্বীরাজের উপর খাজা মঈনুদ্দীনের অভিশাপ ঃ ইতিহাস থেকে জানা যায়। প্রথম তরাইনের যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরী পরাজিত হয়ে পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এ যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে পরাজিত ও নিহত হন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের

www.pathagar.com

পশ্চাতে খাজা মঈনুদ্দীন- এর অভিশাপ খুবই কার্যকর হয়েছিল। প্রথমত হযরত খাজা মঈনুদ্দীন পৃথ্বীরাজকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার জন্য এক চিঠিতে দাওয়াত দিয়েছিলেন। খাজা মঈনুদ্দীন তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেন। হে পৃথ্বীরাজ মূর্তি হল অচেতন পদার্থ যার কোন শক্তি নেই। সে মানুষের কল্যাণ অকল্যাণ কিছুই করতে পারে না বিধায় মূর্তিপূজার মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত নেই। সারা জাহানের মালিক আল্লাহ তাআলা এক অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরীক নেই, তুমি সে প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ কর। খাজা মঈনুদ্দীন এর এহেন সারগর্ভ চিঠি পেয়ে পৃথ্বীরাজ ক্রোধে উন্মাদ হয়ে পড়ে। পৃথ্বীরাজ সত্যের সৈনিক হরত খাজা মঈনুদ্দীনের এক প্রাণপ্রিয় মুরীদ কর্মচারীকে অবৈধভাবে চাকুরী হতে বরখাস্ত করায় খাজা মঈনুদ্দীন লিখে জানান। "আমি তোমাকে জিন্দা অবস্থায় মুসলমান সৈন্যদের হাতে অর্পণ করলাম।

চিশতিয়া তরীকা ঃ ইলমে মারেফাতের অনেকগুলি তরীকার মধ্যে চারটি তরীকাই প্রসিদ্ধ। যেমন চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশাবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া, চিশত হিন্দুস্থানের একটি ছোট গ্রামের নাম। এ গ্রামেই খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) ও অধিকাংশ তাপস অবস্থান করতেন বলে তাঁর নামানুসারে তাঁদের প্রবর্তিত তরীকার নামদেয়া হয়েছে চিশতিয়া তরীকা। তবে কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায়। চিশতিয়া তরীকা খাজা মঈনুদ্দীনের পূর্বেও প্রচলিত ছিল। তবে তাঁর সময় এ তরীকা পূর্ণাঙ্গ বিকাশ লাভ করে।

ইহধাম ত্যাগ ঃ রূহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী হিজরী ৬২৭ সালের ৬ই রজব এশার নামায

www.pathagar.com

আদায় করে নিজ কক্ষে ঢুকেন, কিন্তু প্রতিদিনের মত ফজরের নামাযের জন্য কক্ষ খুলছে না, যার কারণে খাদেমগণ দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে দেখলেন খাজা মঈনুদ্দীনের প্রাণবায়ু শেষ হয়ে গেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। খাজা মঈনুদ্দীন যে হুজরাতে মৃত্যুবরণ করেন সেই হুজরাতেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

কবি গোলাম মোস্তফা

ভূমিকা ঃ যে সকল কবির কবিতার মাধ্যমে ইসলামের অগ্রগতি উন্নতি সাধিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুসলিম রেনেসার কবি, সত্যের সেনানী কবি গোলাম মোস্তফা।

পরিচয় ঃ সত্যের সৈনিক কবি গোলাম মোস্তফা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যশোর জিলার ঝিনাইদহ মহকুমার শৈলকুপা থানার মনোহরপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কাজী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের অধিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার পাংশা থানায়। তাঁর পিতার নাম কাজী গোলাম রব্বানী এবং পিতামহ কাজী গোলাম সরওয়ার। কবির পরিবার ছিল উচ্চ শিক্ষিত ও ইসলামী আদর্শে গঠিত। পরিবারের প্রতিটি লোক ইসলামী অনুশাসন মেনে চলত। পিতা ও পিতামহ ছিলেন সর্বভাষায় অভিজ্ঞ, বিশেষ জ্ঞানী। তৎকালে কবির পরিবারে আরবী, ফার্সী ও মাতৃভাষায় নিয়মিত সাহিত্যচর্চা হত। এমনকি তাদের বাড়ীতে প্রতি সপ্তাহে সাহিত্য চর্চার আসর বসতো।

www.pathagar.com

বাল্যকাল ঃ কবি গোলাম মোস্তফার মধ্যে ছোট্ট বেলা হতেই কবিত্ব ভাব ফুটে উঠেছিল। কবি চার বৎসর বয়সেই লেখাপড়া শুরু করেন। প্রথম দিকে পিতার কাছে পড়াশুনা শুরু করলেও পরে পিতা তাঁকে পার্শ্ববর্তী দামুকদিয়া গ্রামের স্কুলে ভর্তি করান।

কিছুদিন এ স্কুলে লেখাপড়া করার পর নিকটবর্তী ফাজিলপুর স্কুলে ভর্তি হন। এরপর তিনি শিক্ষা লাভ করেন শৈলকুপা হাই স্কুলে। ছোট বেলা হতেই তিনি ছিলেন মেধাবী ও অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তাঁর মধ্যেই শৈলকুপা হাই স্কুল থেকেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

উচ্চ শিক্ষা ঃ কবি গোলাম মোস্তফা কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর ১৯১৬ সালে খুলনার দৌলতপুর কলেজ থেকে এফ, এ পাস করেন। এরপর তিনি ভর্তি হন কোলকাতার রিপন কলেজে এবং এ কলেজ থেকেই ১৯১৮ সালে বি. এ, পাস করেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারলেন না।

কর্মজীবন ঃ শিক্ষা জীবন শেষ করার পর কবি গোলাম মোস্তফা ১৯২০ সালে কারাকপুর গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে শিক্ষক পদে চাকুরীতে যোগদান করে দু'বছর পর ডেভিড় পুরস্কার লাভ করেন। কবি শিক্ষকতার পাশা-পাশি কাব্য ও সাহিত্যচর্চায় ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর লেখনীতে নির্গত হয়েছে বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্য জ্যোতির্ময়ী। ১৯২৪ সালে কবি হেয়ার স্কুলে বদলী হন। এ স্কুলে নয় বছর শিক্ষকতার পর বদলী হন কোলকাতা মাদ্রাসায়। ওখানে কিছুদিন

www.pathagar.com

চাকুরী করার পর বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে বদলী হন। কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি প্রধান শিক্ষক হিসেবে প্রমোশন লাভ করেন। হিন্দু প্রভাবিত কোলকাতায় কবি গোলাম মোস্তফা ছিলেন সেকালের প্রথম মুসলিম প্রধান শিক্ষক। কেননা, সে সময় অফিস আদালতে, স্কুল কলেজে, মুসলমানদেরকে নিয়োগ দেয়া হত না, বরং হিন্দুদেরকেই নিয়োগ দেয়া হত। ১৯৪০ সালে প্রধান শিক্ষক হিসেবে বদলী হয়ে আসেন বাকুরা জেলা স্কুলে এবং ১৯৪৬ সালে ফরিদপুর জেলা স্কুলে বদলী হন। ১৯৫০ সালে কবি স্বেচ্ছায় চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন, শিক্ষকতার জীবনে সাহিত্যচর্চাও করতে থাকেন।

জাতীয় জীবনে কবির প্রভাব ঃ কবি ছিলেন রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি। পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম লীগের প্রতি ছিল তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন। তিনি বিশ্বাস করতেন, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজ ইচ্ছা করলেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামকে জয়ী করতে পারে এবং স্বাধীন ও সমৃদ্ধ হতে পারে। যার কারণে তিনি চেয়েছিলেন ইসলামী বিপ্লব।

কবিতা লেখার যুগ ঃ কবি গোলাম মোস্তফা যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র তখন থেকেই কবিতা লেখা শুরু করেন। শুধু কবিতা নয়, বন্ধু বান্ধবদের কাছে কবিতার মাধ্যমে চিঠি লেখতেন কবির বয়স যখন দশ বৎসর তখন তাঁর লেখা কবিতা পত্রিকায় ছাপা হয়।

কবির কাব্যগ্রন্থ ঃ কবি জীবনে বহু কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে প্রথম কাব্যগ্রন্থ হল রক্তরাগ। এ ছাড়া মাসিক

www.pathagar.com

মোহাম্মাদি মোসলেম ভারত, আল-ইসলাম, প্রবাসী ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর রচিত কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি কবিতা ছাড়াও প্রবন্ধ ও গজল এবং হামদ নাত লেখতেন। কবি সবচেয়ে আলোচিত হয়েছেন পবিত্র কোরআনের সূরা ফাতেহার অনুবাদ কবিতা আকারে লেখে।

ইহধাম ত্যাগ ঃ ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে কবি হঠাৎ সেরিব্রাল স্ট্রীমবসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন, তাঁকে সুচিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া

ভূমিকা ঃ পথহারা পথভোলা মানব জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিবার জন্যই সত্যের সৈনিক হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়ার শুভ জন্ম। সাধারণ মানুষের জীবনধারা ইসলামী ছাঁচে গড়ে তোলার নিমিত্তে ও ভারতে ইসলাম প্রচারে যে সকল মহামানব অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে সুফী সাধক হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) অন্যতম।

পরিচয় ঃ ইতিহাস পাঠে জানা যায়, হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া ৬৩৭ হিজরীতে বদায়ুনে জন্ম গ্রহণ করেন। সৈয়দ মোহাম্মদ বদায়ুনে তার ধর্ম শিক্ষা শেষ করেন। এরপর তিনি পাকপট্টনে বাবা

www.pathagar.com

ফরিদ গঞ্জে শকরের সাথে বাস করতে থাকেন। তাঁর ভক্তিভাব ছিল খুবই উচ্চ স্তরের। ছোটকে স্নেহ বড়কে মান্য করা তাঁর বিশেষ গুণ। ইতিহাসবেত্তাদের মতে মাত্র বিশ বছর বয়সে হযরত বাবা ফরিদ তাঁকে শেখ জামাল হাসুভির কাছে পাঠিয়ে দেন। শেখ জামাল হাসুভী তাঁকে দিল্লীতে ইসলাম প্রচার করার জন্য নিয়োগ করেন। সত্যের দিশারী হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) যে একজন নির্বাচিত জীবনসন্ধানী ছিলেন তাই নয়, তিনি ইবাদত বন্দেগীর দ্বারা বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্যও লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি জনসেবা ও ঐশী প্রেমের ক্ষেত্রে তৎকালীন সময় একজন নামকরা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জীবনের চাওয়া পাওয়াই ছিল আল্লাহ ও রাসূলের রেজামন্দি এবং মানব সেবায় নিজেকে বিলীন করে দেয়া। ভারতের ইতিহাসে সুফী সাধক হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়ার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। শুধু তাই নয় প্রতিটি মুসলিম নরনারী তাঁর নাম বিশেষ ভাবে স্মরণ করবে।

শিক্ষা গ্রহণ ঃ হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া প্রাথমিক শিক্ষা গ্রাম্য মক্তবে সমাধা করে কোরআন শরীফ শিক্ষার জন্য এক ওস্তাদের নিকট যান। তিনি পবিত্র কোরান শরীফ খতম করে ফেকাহ শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করার জন্য সেকালের বিখ্যাত আলেম মাওলানা আলাউদ্দিন উমুলীর নিকট ফেকাহ শাস্ত্রের প্রাথমিক কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। মক্তবের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর মায়ের কথামত প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও পীরে কামেল হযরত মাওলানা শামসুদ্দিন (রঃ)-এর কাছে যান। তিনি অল্প দিনের মধ্যে জ্ঞানে গুণে শামসুদ্দিন সাহেবের নজরে পড়ে গেলেন। যার কারণ তিনি নিজামুউদ্দীনকে বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। সেখান থেকে ধর্মীয় শাস্ত্র ফেকাহ, উসুল, আকায়েদ, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে

www.pathagar.com

জ্ঞান অর্জন করার পর হাদীস শিক্ষার জন্য তৎকালীন দিল্লীর সর্বশ্রেষ্ঠ বুজুর্গ ও হাদীস বিশারদ হযরত মাওলানা কামাল উদ্দিনের নিকট যান। তাঁর কাছ থেকে সুনাম সুখ্যাতিসহ হাদীস শিক্ষা সমাপ্ত করেন। হযরত খাজা নিজামুউদ্দিন কেবল তাঁর কাছে হাদীস শাস্ত্রেই পান্ডিত্য অর্জন করেন না, তিনি একাধারে জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, তাফসীর, বালাগাত, উসুল, ফিকাহ, আকায়েদ, ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কেও বিভিন্ন আলিমের নিকট জ্ঞান অর্জন করেন।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ ঃ হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া জাগতিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের জন্য মোর্শেদে কামেল হযরত শায়েখ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রঃ)-এর কাছে যান। তিনি তাঁর কাছ থেকে মারেফতের তালীম তরবিয়ত গ্রহণ করেন। হিজরী ৬৫৫ সালের ১০ই রজব হতে পরবর্তী সালের ২রা রবিউল আউয়াল পর্যন্ত তিনি তালিম, তরবিয়ত ও তাওয়াজ্জুহ গ্রহণ করেন।

আদর্শের মূর্ত প্রতীক ঃ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, দিল্লীর সম্রাটদের অনেকেই হযরত খাজা নিজামুউদ্দিন আওলিয়ার মুরীদ ছিলেন। এমনকি সম্রাটের পুত্র শাহজাদা খেজেরখাঁও হযরত নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করেন। নিজামুউদ্দীন আওলিয়া যে একজন আদর্শ মানব ছিলেন তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে তাঁর প্রতিটি কাজকর্মে আচার আচরণ। তিনি শাহাজাদাদের সাথে যেমনি ব্যবহার করতেন তেমনি ব্যবহার করতেন গরীব দুঃখী অসহায়দের সাথেও। তাঁর কাছে ধনী গরীবের কোন প্রভেদ ছিল না। তিনি জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে সকলের সাথেই সমতা রক্ষা করে চলতেন।

www.pathagar.com

উপদেশাবলী ঃ হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া বিশ্ববাসীকে সঠিক পথে চলার পাথেয় হিসাবে বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। তার মধ্যে প্রথম উপদেশ হল গর্ব অহংকার থেকে নিজেকে বিরত রাখা। কেননা গর্ব অহংকার সবচেয়ে ক্ষতিকর। তা মানুষকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করে। মানুষকে বহুক্ষেত্রেই ধনবল, জনবল দাম্ভিক অহংকারী করে তোলে। তাই প্রত্যেকের উচিত আল্লাহ তাআলার রেজামন্দি হাসিলের নিমিত্তে গর্ব অহংকার থেকে দূরে থাকা। দ্বিতীয় উপদেশ হল, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা, কেননা বিনয় ও নম্রতার মাঝে পরিপূর্ণ সফলতা বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বীন ইসলামের খেদমত ঃ মাহবুবে ইলাহী সুলতানুল আওলিয়া হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া সারা জীবন ইসলাম প্রচারে বিলীন করে দেন। তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহও রাসূলের আদর্শ বাস্তবায়িত করে গেছেন। তাঁর আদর্শ চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে বহু বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইসলামের খেদমত করতে গিয়ে নিজামিয়া তরীকা প্রতিষ্ঠা করেন এটা চিশতিয়া তরীকার এক শাখা। আজও বহু ব্যক্তি এই তরীকায় ইবাদত করেন।

ইন্তেকাল ঃ রূহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া ৭২৫ হিজরীতে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন সুলতান রুকনুদ্দীন। নিজ বাসস্থানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ বিন কাসিম

সূচনা ঃ ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বিজয়ীর বেশে সবার আগে যে মুসলমান ভারতের মাটিতে পা রেখেছেন। তিনি হলেন সত্যের সৈনিক ১৭ বছর বয়স্ক সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম। মুহাম্মদ বিন কাসিম শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি হলেন ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রনায়ক ও মানবতার মহানায়ক। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী।

পরিচয় ঃ মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা। ছোট বেলায়ই তাঁর মধ্যে প্রখর মেধা ফুটে উঠেছিল। অতি অল্প বয়সেই মুহাম্মদ বিন কাসিম শিক্ষা দীক্ষা ও গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি, ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতা দেখে তৎকালীন ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁকে ফারেস প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন, কেবল শাসনকর্তা নিয়োগ করেই ক্ষান্ত হননি বরং স্বীয় কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর বুদ্ধি ও মেধা দ্বারা অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে ফারেস প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের অবদান ঃ ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সত্যের দিশারী মুহাম্মদ বিন কাসিমের উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহের মধ্যে ঐতিহাসিক সিন্ধু বিজয়ি

www.pathagar.com

অন্যতম। কেননা পৃথিবীর কোন স্থানে কোন নতুন আদর্শ ও আইন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সুদূর কৌশলগত উপায়ে সেস্থানে আধিপত্য স্থাপন করতে হয় তাহলেই চূড়ান্ত সফলতা আসে।

বিজয়ের ধারা ঃ সেনাপতি ওবায়দুল্লাহ ও বুদাইলের নেতৃত্বের পরপর দুটি অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর সত্যের সৈনিক মুহাম্মদ বিন কাসিম ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে চূড়ান্ত অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইসলামের বিপ্লবী কণ্ঠস্বর, সতের বছর বয়সের তরুণ সেনাপতি ইরাকের পথ ধরে। মেকারান হয়ে সিন্ধুপানে ছুটলেন। মাকরানের মুসলিম অধিনায়ক সূচনা করেন। একদল সৈন্যসহ তাঁর সাথে মিলিত হন। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে দেবলে পৌছেন এবং বিনা বাধায় কেবল অধিকার করেন। এরপর নিরুন জয় করে তিনি ঐতিহাসিক রাওয়ার নামক স্থানে সিন্ধুরাজ দাহিরের সম্মুখীন হন। দাহির তার সবসৈন্য সামন্ত একত্রিত করেও পরাজিত হলেন। দাহিরের সহধর্মিনী ও প্রিয় পুত্র রাওয়ারের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তবে তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে সঙ্গীদেরসহ মুসলমানদের হাতে অপমানের ভয়ে প্রজ্বলিত আগুনে আত্মাহুতি দিলেন। বিজয়ের মালা ছিনিয়ে আনায় বিজয় উল্লাসে মনের হরর্ষে সত্যের দিশারী মুহাম্মদ বিন কাসিম ব্রাহ্মণাবাদের দিকে ধাবিত হন এবং বিনা যুদ্ধেই এ নগরী আয়ত্তে আনেন। এরপরে তিনি ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে মুলতান করতল গত করেন। সুলতান বিজয়ের মধ্য দিয়ে দাহিরের সমগ্র রাজ্য মুহাম্মদ বিন কাসিমের অধীনে আসে এবং ইতিহাস সৃষ্টিকারী সিন্ধু বিজয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

www.pathagar.com

ন্যায়ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ঃ মুহাম্মদ বিন কাসিম বয়সে ছোট হলেও জ্ঞানে গুণে প্রতিভায় ছিলেন একজন আদর্শ সৈনিক পুরুষ, একজন দক্ষ ও সুযোগ্য শাসক। তিনি তাঁর চিন্তা, মেধা কেবল একটি ন্যায়ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই ব্যয় করেছেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম সাম্য ও ন্যয় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কেননা তিনি বুঝতেন। ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করা যায় না। তবে একথাও বাস্তব, সত্য সন্ত্রাস আর অত্যাচারের মাধ্যমে সাময়িক প্রভুত্ব অর্জন করা গেলেও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার মোটেই সম্ভব নয় যে কারণে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু প্রদেশের অধিনায়ক হয়ে, একটি সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক শাসন ন্যায় ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন।

পীর দরবেশদেরকে আমন্ত্রণ ঃ সোনালী ইসলামের বিমল আদর্শ প্রচার প্রসারের জন্য সত্যের অগ্রনায়ক মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করার পর আরবের পীর দরবেশ আলেম ওলামাকে সিন্ধুতে আসার জন্য বিশেষ দাওয়াতপত্র পাঠান। মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিশেষ দাওয়াতে বহু ধর্ম প্রচারক সিন্ধুতে আসেন এবং তারা মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ইসলাম প্রচারের নতুন ধারা সূচনা করেন। তারা অমুসলিমদের কাছে সোনালী ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরেন। এসকল ধর্ম প্রচারকের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তাবেয়ী বা তাবে তাবেয়ীন। আল্লাহ তাআলার অসীম রহমতে এদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার পথহারা পথভোলা অমুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ ধারণা অর্জন করে, সত্য ধর্ম ইসলামের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

www.pathagar.com

সিন্ধু দেশের হিন্দুদের মন জয় ঃ মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু দেশ জয় করার পর নিয়ম নীতির মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করতে লাগলেন। সকল ধর্মের লোকেরা যাতে ব্যক্তি স্বাধীনতা পায় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখেন, যে কারণে সিন্ধু দেশের হিন্দুরাও তাঁর একান্ত ভক্ত ছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম হিন্দুদের বানানো মন্দিরগুলো কায়েম রাখেন এবং তাদের পন্ডিত পুরোহিতগণকে রাজকীয় সম্মান দিতেন। এমন কি সরকারী পদের অধিকাংশ পদ হিন্দুদেরকে দেয়া হত। হিন্দুরা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন।

ইহধাম ত্যাগ ঃ সৈনিক মুহাম্মদ বিন কাসিমকে কয়েদ খানায় বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়, যখন তাকে হত্যা করা হয় তখন তাঁর বয়স ছিল আনুমানিক ২২ বছর।

আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল

ভূমিকা ঃ মুসলিম দুনিয়ায় সত্যের দিশারী আল্লামা ইকবাল ছিলেন বরেণ্য কবি, ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। মুসলিম সমাজের সর্বস্তরের লোকের কাছে ইকবাল ছিলেন একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব। আল্লামা ইকবালের জীবনের চাওয়া পাওয়াই ছিল মহান করুণার আধার আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। তাঁর প্রত্যেকটি হৃদয় গ্রাহী কবিতা পথহারা পথভোলা মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধান দিয়েছেন।

www.pathagar.com

পরিচয় ঃ দার্শনিক কবি আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল ১৮৭৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ২৪ জিলহজ্জ ১২৮৯ হিজরী পাঞ্জাবের অন্তর্গত শিয়ালকোর্ট শেখ নূর মুহাম্মদের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। শিশু ইকবাল জন্ম গ্রহণ করার পর তাঁর পিতা মাতা নাম রাখেন আদর করে, যার অভিধানগত অর্থ হল সৌভাগ্য। পূর্ণ নাম মুহাম্মদ ইকবাল পরবর্তীকালে স্বধর্মাবলম্বীদের মনে ঈমান ও ইসলাম প্রীতির উন্মেষ ঘটাতে গিয়ে তিনি যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেন তারই ফল তার উপাধি হয় আল্লামা।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, আল্লামা ইকবালের পিতা শেখ নূর মুহাম্মদ ছিলেন অত্যন্ত আল্লাহওয়ালা লোক। তাঁর জীবনের চাওয়া পাওয়াই ছিল আল্লাহ ও রাসূলের রেজামন্দি তিনি এমন কিছু করতেন না যাতে আল্লাহ তাআলা অখুশী হন। তিনি টুপি সেলাই করে জীবিকানির্বাহ করতেন। সামান্য অর্থ দিয়ে সংসার পরিচালনা করা হলেও আল্লাহ তাআলার উপর ছিল তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস। ইকবালের মাও ছিলেন অত্যন্ত আবেদা। তাঁর মা যে সৎভাবে জীবন যাপনের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতেন তার জলন্ত প্রমাণ বহন করে, একটি ঘটনা ইকবালের পিতা একবার শিয়ালকোর্টের এক সরকারী কর্মচারীর অধীনে কাজ নেন। কিন্তু ইকবালের মা মনে করলেন স্বামীর উপার্জিত অর্থ শরীয়ত সিদ্ধ না। তখন তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, স্বামীর উপার্জিত টাকা স্পর্শ করবেন না। পরবর্তীতে আল্লামা ইকবালের পিতা স্ত্রীর কথা মত চাকুরী ছেড়ে দেন।

শিক্ষাজীবন ঃ ইকবালের পিতা শৈশব অবস্থায় ইকবালকে লেখাপড়ার জন্য তৎকালের এক সুপন্ডিত মৌলভীর কাছে পাঠান। এই মৌলভীর নাম ছিল সৈয়দ মীর হাসান। তিনি ছিলেন স্থানীয় শিয়াল

www.pathagar.com

কোট মিশন স্কুলের আরবী, ফার্সীর অভিজ্ঞ শিক্ষক। শিক্ষক মীর হাসান ছিলেন ইকবালের পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু। মাওলানা মীর হাসান আল্লামা ইকবালকে নিজের ছেলে মনে করে মনোযোগ সহকারে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাছাড়া ইকবালের সুযোগ্য শিক্ষক ইকবালকে পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমীর ফার্সী কবিতা পাঠ করে শুনাতেন। যোগ্য শিক্ষকের কাছে রুমীর কবিতা শুনে ইকবালের হৃদয়পটে বালক বয়সেই কাব্যের প্রতি গভীর আসক্তি জন্মে। মাওলানা মীর হাসানের কাছ থেকে লেখাপড়া শেষ করে ইকবাল মিশন স্কুলে ভর্তি হন। মিশন স্কুলে লেখাপড়া করা অবস্থায়ই ইকবাল কবিতা লেখতেন। তখন উর্দুর বিখ্যাত কবি দাস দিল্লী ছেড়ে হায়দরাবাদের নওয়াবের আশ্রয়ে বাস করছিলেন। আল্লামা ইকবাল কবি দাসের কাছে তাঁর কবিতা পাঠাতেন সংশোধনের জন্য। আল্লামা ইকবাল ছাত্র অবস্থা থেকেই কবিতা লেখলেও তাঁর লেখাপড়ায় মোটেই ব্যাঘাত হত না। প্রতি বৎসর তিনি ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করতেন। প্রাইমারী ও মিডল পরীক্ষায় তিনি সুনামের সাথে বৃত্তি লাভ করেন। তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষাতেও সরকারী বৃত্তি পান। ইতিমধ্যে ইকবাল স্কুল জীবন শেষ করে কলেজে ভর্তি হন, কলেজে ভর্তি হবার সময় ইকবালের পিতা শেখ নূর মুহাম্মদ ছেলের নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, লেখাপড়া শেষ করে মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে ইসলামের খেদমতে অতিবাহিত করবেন। কর্মজীবনে ইকবাল এই অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইকবাল মিশন কলেজ থেকে এফ, এ, পাশ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য শিয়ালকোর্ট ত্যাগ করে লাহোরে আসেন। তখন লাহোর ছিল পাঞ্জাবের শিক্ষা কেন্দ্র। ইকবাল লাহোরের নামকরা সরকারী কলেজে ভর্তি হন। ইকবালের পিতার আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। বড় ভাই আতা মুহাম্মদ

www.pathagar.com

চাকুরী করে কোন রকমে সংসারের খরচ চালাতেন এবং ছোট ভাই ইকবালের লেখাপড়া চালাতেন। লাহোরে এসে ইকবাল এক সুযোগ্য অধ্যাপক পেলেন, তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখলেন। ১৮৯৭ সালে আরবী ও ইংরেজীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং দুটি স্বর্ণপদক লাভ করে তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হন। বি. এ. পাস করার দুই বৎসর পর কৃতিত্বের সাথে দর্শন শাস্ত্রে এম. এ, পাস করে স্বর্ণপদক পান।

কর্মজীবন ঃ আল্লামা ইকবাল এম. এ. পাস করার সাথে সাথেই লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুদিন যেতে না যেতেই সরকারী কলেজে ইংরেজী ও দর্শন শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক পদ লাভ করেন। এ সময় তিনি অর্থনীতি সম্বন্ধে উর্দু ভাষায় সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন।

ইকবাল অত্যন্ত সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। সুখ শান্তির দিকে মোটেই খেয়াল ছিল না, তার প্রত্যহিক সূচীর মধ্যে ছিল খুব সকালে নামায পড়া, আর নামায অন্তে কোরআন শরীফ পড়ত, কোরআন তেলাওয়াত শেষ হলে সামান্য কিছু সময় ব্যায়াম করে মনোনিবেশ করতেন বইয়ের স্তূপের মধ্যে। ১৯০৫ সালে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ইকবাল বিলাত যাত্রা করেন। ১৯০৬ সালে জার্মানীর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। ১৯১১ সালে অধ্যাপনার পেশা ত্যাগ করে আইন ব্যবসা শুরু করেন। আল্লামা ইকবাল সাংসারিক প্রয়োজনে আইস ব্যবসা শুরু করেন সত্য, কিন্তু মাস চলার মত টাকা হলে আর মোকদ্দমা গ্রহণ করতেন না। এমন কি যে মামলায় মক্কেলের জন্য কিছু ভাল করার সম্ভাবনা থাকতো না সে মামলা গ্রহণ করতেন না।

www.pathagar.com

লিখিত গ্রন্থাবলী ঃ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে আল্লামা ইকবাল আত্মদর্শন সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত মতবাদ প্রকাশ করেন এবং দুইখানা গ্রন্থও রচনা করেন। গ্রন্থ দুইখানা মুসলিম সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। গ্রন্থ দু'খানার নাম হল আসরারে খুদী ও রমুজে বেখুদী এছাড়া তিনি বহু কবিতা লেখেছেন যা ছিল মুসলানদের হৃদয়ের খোরাক। আল্লামা ইকবালের লেখনের প্রতিভা ও সুনাম সুখ্যাতি উপমহাদেশের বাইরে অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর অনেক কবিতা সংকলন আকারে বের হয়। যেমন পায়ামে মাশারিক, জাবুরে আজম, বাদেদারা, বালে জিব্রীল, জাবেদমামা।

ইহধাম ত্যাগ ঃ আল্লামা ইকবাল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জুপাল নওয়াব হামীদুল্লাহ খান তাকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে বৃত্তি দিয়েছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল যুগবরেণ্য এ দার্শনিক ও কবি ইহধাম ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বৎসর। লাহোর শাহী মসজিদের সিড়ির বাম পার্শ্বে কবির নশ্বরদেহ সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর এই পবিত্র মাজারে দেশ বিদেশের বহু ভক্তগন জিয়ারতের জন্য আসেন।

কাজী নজরুল ইসলাম

ভূমিকা ঃ দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যিনি বড় হয়েছেন, যার জীবনের চাওয়াপাওয়া ছিল সত্য প্রতিষ্ঠা করে জগতের মাঝে

www.pathagar.com

ইসলামের অমীয় সুধা পৌঁছে দেয়া, যিনি বাংলা কাব্য ও সাহিত্যে প্রচন্ড বিপ্লব ঘটিয়ে নিজেকে ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন, যিনি ছিলেন সত্যের সৈনিক, কবি, সাহিত্যিক, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কণ্ঠস্বর, তাঁর নাম কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর নাম ছিল দুঃখু মিয়া।

পরিচয় ঃ মুসলীম পুনর্জাগরনের কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ মোতাবেক ১৮৯৯ সালের ২৫শে মে পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকীল আহমদ, দাদার নাম কাজী আমানুল্লাহ। মাতার নাম জাহেদা খাতুন ও মামার নাম তোফায়েল আলী। ধন সম্পদে নজরুলের পিতা বড় লোক না হলেও উচ্চ বংশের ছেলে ছিলেন। ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, কাজী নজরুলের পিতা ও দাদা সম্রাট শাহ আলমের সময় পাটনার হাজীপুর থেকে চুরুলিয়ায় আসেন। কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর দক্ষিণ দিকে পীর পুকুর নামে একটি ঐতিহাসিক বড় দীঘি আছে, যে দীঘির পাশে রয়েছে ফকির হাজী পাহলোয়ানের দরগাহ, আর অন্য পারে রয়েছে এক মসজিদ। কবির দাদা ও পিতা মাজার এবং মসজিদের খাদ্দেম ও ইমাম ছিলেন। কাজী ফকীর আহমদ মসজিদের খাদ্দেম ও ইমামতি আর মিলাদ জলসায় বক্তৃতা করে যে উপার্জন হত তা দিয়ে সংসার চালাতেন।

বাল্যকাল ঃ কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিজ গ্রামের মক্তবেই শিক্ষা জীবন শুরু করেন। আল্লাহ তাআলার অসীম রহমতে

www.pathagar.com

মাত্র দশ বৎসর বয়সে সুললিত কণ্ঠে কোরআন শরীফ পড়তে পারতেন। বাল্যকাল হতেই তিনি ইসলামী আদর্শে জীবন গঠন করেন। যেহেতু তাঁর গোটা পরিবারই ছিল ইসলামী আদর্শে গঠিত। তিনি গ্রাম্য মক্তবে বাংলা ও আরবী শিক্ষার পাশাপাশি ফার্সী ভাষাও শিখতে থাকেন। কবির মেধা ছিল খুবই প্রখর। একবার যা শুনতেন তা আর জীবনে ভুলতেন না। অতীব দুঃখের বিষয় হঠাৎ করে তাঁর পিতা ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর পিতার ইহধাম ত্যাগে কবির শিক্ষার পথ বন্ধ হয়ে যায়। সংসারে নেমে আসে অভাব অনটনের কালো ছায়া। যার কারণে কবির লেখাপড়া করা আর সম্ভব হল না। লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবার পর তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করেন। কবি যে লেটো গানের দলে যোগ দিয়েছিলেন তাতে কোন অশ্লীল গান পরিবেশিত হত না বরং তাতে পরিবেশিত হত জারি গান, পালাগান, মুর্শিদী ইত্যাদি। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি নিজ প্রতিভাবলে লেটো দলের প্রধান নির্বাচিত হন। চেষ্টা ও প্রতিভাবলে মানুষ যে বহুদূর আগাতে পারে তার উজ্বল প্রমাণ কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি লেটো গানের দলে থেকেই বিভিন্ন বইপত্র পড়ে সাহিত্যচর্চা চালিয়ে যান। এরপর তিনি আবার লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করলেও আর্থিক অনটনে আসানসোলের এক রুটির দোকানে মাত্র ৫ টাকা মাসিক বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। রুটির দোকানে চাকুরী করেও তাঁর মেধা কাজে খাটিয়েছেন, তিনি রুটির দোকানে চাকুরী করা অবস্থায়ও কবিতা, গান, গজল রচনা করেন, এবং বিভিন্ন বই, পত্রপত্রিকা পড়ে জ্ঞান অর্জন করে থাকেন। কবির প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে জনৈক পুলিশ ইন্সক্টের তাঁকে সাথে নিয়ে আসেন এবং ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুর হাই স্কুলে ভর্তি করে দেন। তিনি রানীগঞ্জের শিয়াসোল স্কুলে ভর্তি হন।

www.pathagar.com

১৯১৭ সালের বিশ্বযুদ্ধের সময় কবি দশম শ্রেণীর ছাত্র। বিশ্বযুদ্ধের কারণে একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর লেখাপড়া করা হল না। তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ৪৯ নম্বর বাঙ্গালী পল্টন রেজিমেন্টের হাবিলদার পদে প্রমোশন লাভ করেন। সৈনিক জীবনে তাঁকে চলে যেতে হয় পাকিস্তানের করাচীতে। কবি সৈনিক জীবনে পা দিয়েও সাহিত্যচর্চা কবিতা লেখা বন্ধ রাখেননি। আল্লাহর অসীম রহমতে করাচী সেনানিবাসে সহকর্মী একজন পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেবের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর নিকট হতে তিনি ফার্সী শিক্ষা লাভ করেন। সৈনিক জীবনে তিনি মহাকবি হাফিজ, শেখ সাদী (রঃ), আল্লামা রুমী (রঃ) প্রমুখ বিশ্বখ্যাত কবিদের রচনাবলী চর্চা করেন। যুদ্ধ থেমে যাবার পর ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে পল্টন রেজিমেন্ট ভেঙ্গে দেয়া হলে তিনি ফিরে আসেন নিজ আবাস ভূমি চুরুলিয়া গ্রামে। দেশে ফিরে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাঁপতে থাকেন। ১৯২১ সালে মাত্র ২২ বৎসর বয়সে তিনি রচনা করেন তার বিখ্যাত অমর কবিতা "বিদ্রোহী।" যা বাংলা সাহিত্যে তাঁকে বিদ্রোহী কবি হিসেবে অমর করে রেখেছে। বিদ্রোহী কবিতার কয়েক লাইন যেমন-

"বল বীর
বল চির উন্নত মম শির
শির নেহারী নত শির ওই
শিখর হিমাদ্রির।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীকে অস্ত্র রূপে ব্যবহার করেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কবির লেখা ছিল বিপ্লবী কণ্ঠস্বর। তিনি প্রতিটি মানুষের হৃদয় লেখনীর মাধ্যমে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

বিদ্রোহী করে তোলেন। কবি সাপ্তাহিক ধূমকেতু পত্রিকায় লেখতে লাগলেন বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। ১৯২২ সালে সাপ্তাহিক ধূমকেতু পত্রিকায় আনন্দময়ীর আগমন কবিতাটি প্রকাশিত হলে বৃটিশ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে তাঁর বইয়ের প্রচার ও প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। বৃটিশ সরকার কবিকে প্রেফতার ও কারারুদ্ধ করেই। ক্ষান্ত হয়নি এবং তার উপরে চালাতে থাকে অমানুষিক নির্যাতন, যা কোন বিবেকবান মানুষ সহ্য করতে পারে না। তবে জেলে থাকা অবস্থায়ও কবির লেখা থেমে থাকেনি। ১৯২৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর কবি কারাগার থেকে মুক্তি পান। মুক্তি পেয়েই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন লেখার কাজে।

কবি জেল হতে বের হয়ে কুমিল্লায় গেলে সেখানে ইন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের বাসায় এক হিন্দু সুন্দরী মেয়ের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর নাম ছিল আশালতা। সুন্দরী আশালতার পিতা জীবিত ছিল না। কবি মনে মনে আশালতাকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত করে ফেলেন। হিন্দু মুসলমানদের অনেকেই এ বিবাহে মতানৈক্য করে, কিন্তু সকল বাধা পেরিয়ে কবি আশালতাকে বিবাহ করেন, নববিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে নজরুল গেলেন হুগলীতে। এ স্ত্রীর গর্ভে নজরুলের এক ছেলে হয় তার নাম রাখা হল আজাদ কামাল। অতীব দুঃখের বিষয় ছেলেটি বেশিদিন বাঁচল না।

ইহধাম ত্যাগ ঃ ১৯৪২ সালে সত্যের দিশারী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এক দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে চিরদিনের জন্য বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। দেশের সকল চিকিৎসা ব্যর্থ হবার পর ১৯৫৩ সালে সুচিকিৎসার জন্য সরকারী খরচে কবিকে লন্ডনে পাঠান হয় কিন্তু লন্ডনেও তার সুচিকিৎসা হয়নি। পরিশেষে ১৯৭২ সালে

www.pathagar.com

তাঁকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় এনে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বহুদিন অসুস্থ থাকার পর বাংলা ১৩৮৩ সালের ১২ই ভাদ্র মোতাবেক ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগষ্ট এ বিখ্যাত কবি পিজি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। কবির অসিয়ত অনুযায়ী তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

আল্লামা শেখ সাদী (রঃ)

সূচনা ঃ বিশ্ববিখ্যাত কবি, ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা শেখ সাদী ছিলেন পথহারা পথভোলা মানুষের দিশারী। যারা নিজের জীবনের সুখ শান্তি উপেক্ষা করে দিন রাত আল্লাহ তাআলার রোমন্দিও মানব কল্যাণে নিজেকে মশগুল রেখেছে, তাদের মধ্যে আল্লামা সাদীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়, সীমাহীন অভাব অনটনের মধ্যেও ধৈর্য্যের ফলে জ্ঞান অর্জন পর্যটন, কাব্য ও সাহিত্য রচনা থেকে তাঁকে কোন অপশক্তি ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। আল্লামা শেখ সাদী ছিলেন বিশ্ববাসীর হাদী ও বিশেষ ব্যক্তিত্ব।

পরিচয় ঃ আল্লামা শেখ সাদী ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দ মোতাবেক হিজরীতে ঐতিহাসিক পারস্যের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শিরাজ নগরের তাউস নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম যাইমুরা খাতুন। আল্লামা শেখ সাদীর পিতৃ প্রদত্ত নাম সৈয়দ শরফুদ্দিন, আর গুরু প্রদত্ত নাম মুসলেহ উদ্দিন। শেখ সাদীর

www.pathagar.com

পিতা ফারেস প্রদেশের শাসনকর্তার অধীনে সরকারী চাকুরী করতেন। সাদীর শৈশবকাল শিরাজ নগরেই বেশী কাটে। তিনি ছোট বেলা থেকেই ইসলামী আদর্শে জীবন গঠন করার জন্য সচেষ্ট হন। পিতা আদর্শ মুসলমান হওয়ার কারণেই তাঁর মধ্যে ইসলামী জীবনের রূপরেখা প্রস্ফুটিত হয়। শেখ সাদী অতি অল্প বয়সেই যোগ্য পিতার নিকট ধর্মীয়বিষয় সমূহ শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র সাত বৎসর তখনই তিনি তাঁর মাতার নিকট কোরআন শরীফ শিখেন। শেখ সাদীর পিতা পুত্রকে সুসন্তান করার মানসে ছোট বেলা থেকেই সাথে করে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতেন। বালক সাদীকে তাঁর পিতা খুবই ভালবাসতেন। কেননা অনেক বৎসর নিঃসন্তান থাকার পর আল্লাহ তাআলা তাঁকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন, যে পুত্র সন্তানের নাম শেখ সাদী। বহু বৎসর পর সন্তান, হওয়ায় শেখ সাদী পিতার নিকট ছিলেন আদরের মাণিক।এ পবিত্র নাম রেখেছে রূহানীজগতের খাটি প্রজ্ঞাদাতা মহাত্মা সুফী শেখ মুসলেহ উদ্দিন তিনি ছিলেন চিশতিয়া তরীকার শেখ সাদীর পিতা আবদুল্লাহ শিরাজী তাঁর মুরিদ ছিলেন। শেখ সাদীর পিতা তাঁর কাছে আদরের ছেলেকে নিয়ে যান দোয়ার জন্য। শেখ মুসলেহ উদ্দিন সাদীর পবিত্র চেহারা দেখা মাত্রই বললেন, আল্লাহর রহমতে তোমার ছেলে ভবিষ্যতে একজন মহাপুরুষ ও বিদ্বান কবি হবেন। এ কথাবলার পরই মুসলেহ উদ্দিন আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে তাঁর নামের সাথে মিশিয়ে সাদীর নাম রাখলেন মুসলেহ উদ্দিন। আদরের ছেলের নাম রাখার পরই শেখ সাদীর পিতা মনের খুশীতে পীর সাহেবকে বললেন হুজুর, আমার আদরের ছেলে মুসলেহ উদ্দিনকে আপনার নিকট সমর্পণ করলাম, আপনি দয়া করে এ ছেলেকে আদর্শ শিক্ষা দীক্ষায় গড়ে তুলুন, বালক সাদী অতি অল্প বয়সে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভে নিয়োজিত হন। পরিতাপের বিষয় হল

www.pathagar.com

কিছু দিনের মধ্যেই মহাত্মা সুফী শেখ মুসলেহ উদ্দিন ইহধাম ত্যাগ করেন। গুরুকে হারিয়ে সাদী মনে খুব ব্যথ্যা পেলেন শেখ মুসলেহ উদ্দিন দুনিয়া হতে বিদায় হওয়ার পর সাদী যোগ্য পিতার কাছ থেকেই বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা নিতে লাগলেন।

শেখ সাদীর হজ্জ পালন ঃ শেখ সাদীর বয়স যখন কেবল মাত্র দশ বৎসরে পদার্পণ করল, তখন শিরাজের শাসনকর্তা আতা বেগ মোজাফফর উদ্দিন শিরাজের অধিবাসীদের পবিত্র হজ্জ পালন করার নির্দেশ দেন। এ আদেশ পেয়ে শিরাজের আমীরগণ পবিত্র হজ্জ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেলেন। তাঁরা তৎকালে শিয়াজের সেরা বিদ্বান ও জ্ঞানী শেখ সাদীর পিতা সৈয়দ আবদুল্লাহকে তাদের মোয়াল্লেম নিযুক্ত করেন। বালক সাদী পিতার হজ্জে যাওয়ার কথা শ্রবণ করা হজ্জে যাওয়ার জন্য পিতামাতার কাছে অনুনয় বিনয় করে আবদার করেন। পিতামাতা শত বাধা দিয়েও বালক সাদীকে যানাতে পারলেন না। অগত্যা পিতামাতা সাদীকেও নিজেদের সাথে নিয়ে যান। হজ্জ করে ফিরে আসার কিছু দিন পরই সাদীর পিতা দুনিয়া হতে বিদায় নেন সাদীর পিতা যখন দুনিয়া হতে বিদায় নেন তখন বালক সাদী মাত্র এগার বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছেন।

অভাব অনটনের মধ্যে সাদী ঃ পিতার মৃত্যুর পর সাদীদের সংসারে নেমে এলো অভাব অনটন। এমনও দিন যেত তাঁরা খেতে পেতেন না। এমন কি বাতি জ্বালাবার মত তেলও ঘরে অনেক সময় থাকত না। এক কথায়, পিতা মারা যাবার পর তাঁদের সংসার খুবই কষ্টের মধ্য দিয়ে চলত। তবে শত কষ্টের মধ্যে দিয়ে চললেও সাদী কারো কাছে হাত বাড়াতেন না বরং ধৈর্যের সাথে কষ্ট স্বীকার

www.pathagar.com

করে নিতেন। পিতা জীবিত থাকা কালীন বালক সাদীর বই পড়ার প্রতি ছিল অধীর আগ্রহ। সন্ধ্যা হলেই সাদীর মনে সাধ জাগত বাতি জ্বালিয়ে বই পড়বেন, কিন্তু তেলের অভাবে সে আশা তাঁর পূর্ণ হতনা। তবুও তিনি প্রতিবেশীদের ঘর হতে জানালা দিয়ে যে আলো আসত সে আলোতে বই পড়তেন।

শিক্ষা গ্রহণ ঃ আল্লামা শেখ সাদী নিজ গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তৎকালের নামকরা আজাদিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হলেন। সেখানে কিছুদিন লেখাপড়া করার পর মাদ্রাসার শিক্ষক ও পরিচালকবৃন্দের নিয়ম নীতি ভাল না লাগায় অন্যত্র যাওয়ার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে শেখ সাদীর মা যামমুরা খাতুন দুনিয়া হতে বিদায় নেন। মায়ের মৃত্যুতে শেখ সাদী অসহায় হয়ে পড়লেন, বুক ভরা ব্যথ্যা নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে ঘরের জিনিসপত্র গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দিয়ে কয়েকটি বই সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটেই বাগদাদ অভিমুখে পাড়ি জমান। হাঁটতে হাঁটতে বালক সাদী বাগদাদের তাইগ্রীস নদীর তীরে এসে উপস্থিত হন। এখানে একদিন বিশ্রাম নিয়ে নদী পার হয়ে বাগদাদ শহরে উপস্থিত হন।

বাগদাদে এসে তিনি কিছুদিন অনাহারে, অর্ধাহারে এবং আশ্রহীন ভাবে দিনের পর দিন পথে পথে ঘুরছিলেন। এমনি সময় আল্লাহ তাআলার অসীম রহমতে একজন সহৃদয় ব্যক্তির সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। এ সহৃদয় ব্যক্তির সাথে পরিচয় হওয়া মানে তাঁর শিক্ষার পথ সুগম হয়ে যাওয়া। তাঁর সহযোগিতায় স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। আল্লাহ তাআলার অসীম রহমতে অল্প দিনের মধ্যেই সাদী নিজ প্রতিভা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও উন্নত মেধার পরিচয় দিয়ে সম্মানিত শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন।

www.pathagar.com

ওখানে কিছু দিন লেখাপড়া করার পরে সম্মানিত শিক্ষকদের একান্ত সহযোগিতায় তৎকালীন বিশ্বের সর্বশেষ্ঠ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হন। নিযামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে বিখ্যাত আলেম আবুল ফাতাহ ইবনে জত্তজী (রঃ)-এর নিকট কোরআন হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় সাদী কিছুদিনের মধ্যেই মাদ্রাসার সর্বশেষ্ঠ মেধাবী ছাত্র বলে সকলের কাছে পরিচিত হন এমনকি মাসিক বৃত্তিও লাভ করেন। মাত্র ৩০ বৎসর বয়সেই ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রনায়ক যুগশ্রেষ্ঠ কবি আল্লামা সাদী তাফসীর, হাদিসে, ফেকাহ, সাহিত্য, দর্শন, খোদাতত্ত্ব ও ইসলামের আনুষঙ্গিক বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন। আল্লামা সাদী কেবল মাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভেই মত্ত ছিলেন না, সাথে সাথে আধ্যাতিক শিক্ষার প্রতিও তাঁর অধীর আগ্রহ ছিল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তির পরে শুরু হয় তাঁর পারিবারিক জীবন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি খালি হাতে পদব্রজে পৃথিবীর আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আল্লামা সাদী পদব্রজে সমগ্র পারস্য, এশিয়া মাইনর, আরব ভূমি, সিরিয়া, মিসর, জেরুজালেম, আর্মেনিয়া, আবিসিনিয়া, তুর্কিস্তান, ফিলিপাইন, ইরাক, কাশগড়, হাবশ, ইয়ামেন, শাম, ভারত উপমহাদেশ ও আফ্রিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। সুদীর্ঘ সফরের ফলে তিনি বিশ্বের ১৮টি ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করে ইতিহাসের পাতায় চির স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি পদব্রজে ১৪ বার হজ্জ সম্পাদন করেছেন। তাঁর ঐ ঐতিহাসিক ভ্রমণ কাহিনী গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। ভ্রমণ কালে আল্লামা সাদী বহু দেশের নিষ্ঠুর জালেম বর্বরদের হাতে অপমানিত হয়েছেন, যা ছিল খুবই বেদনাদায়ক। দ্বাদশ শতাব্দীতে ফিলিস্তীনী খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের

www.pathagar.com

মধ্যে যখন যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করে তখন খ্রীষ্টানদের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য শেখ সাদী এক নির্জন জঙ্গলে আশ্রয় নেন। নির্জন জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েও খ্রীষ্টানদের কবল হতে রক্ষা পাননি। তাঁকে জঙ্গল হতে ধরে নিয়ে বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরী হতে আনীত ইহুদীদের সাথে পরিখা খননে নিযুক্ত করে। তখন তাঁর অবস্থা কত যে অসহায় ছিল তা বলার মত নয়। হঠাৎ সেই পথ দিয়ে আলেপ্পো শহরের এক সম্ভ্রান্ত বণিক যাচ্ছিলেন যার সাথে সাদীর অনেক পূর্বে পরিচয় হয়েছিল। তাঁকে দেখা মাত্রই সকল ঘটনা খুলে বললেন বণিক সকল ঘটনা শুনে দয়ার হাত বাড়িয়ে মনিবকে ১০ দিনার ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে সাথে আলেপ্পো শহরে নিয়ে যান।

সাদীর বিবাহ ঃ আল্লামা সাদী আলেপ্পো শহরে এসে বেশ কিছু দিন কাটাল। কিন্তু আলেপ্পো শহরে তাঁর ভাল লাগল না,তাঁকে দেখলেই মনে হত তিনি যেন নিরন্তর কি একটা ভেবে চলেছেন। বণিকের এক বদমেজাজি বয়স্কা কন্যা ছিল। তাঁর বদমেজাজি ও রূঢ় আচার ব্যবহারের কারনে সেকালের কোন ছেলেই তাকে বিয়ে করতে রাজী হতনা, সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বণিক ১০০ দিনার মোহরের বিনিময়ে বদমেজাজী বয়স্কা কন্যাকে শেখ সাদীর নিকট বিবাহ দেন এবং দেন মোহরের অর্থ বণিক নিজেই আদায় করে দেন। সাদীর জীবনে যত বিপদ এসেছে তা তিনি মনের খুশীতে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন। বৈবাহিক জীবনে আবদ্ধ হবার পর সাদী সুখের মুখ দেখতে পেলেন না। এক দিন বদমেজাজি রমণী সাদীকে উপহাস করে বললেন তুমি কি সেই হতভাগা, যাকে আমার আব্বা দয়াপরবশ হয়ে ১০ দিনার মূল্যে মুক্ত করে ছিলেন? আল্লামা সাদী মলিন মুখে বললেন

www.pathagar.com

হাঁ সুন্দরী। আমি সেই হতভাগা যাকে তোমার পিতা ১০ দিনার মুক্ত করে ১০০ দিনারে তোমার দাসত্বে নিযুক্ত করেছেন। সাদী সুন্দরীকে লক্ষ্য করে আরো বললেন, আল্লাহ্ তাআলা এমনিভাবে অভাব অনটন দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে আপন করে নেয়।

কাব্য গ্রন্থ রচনা ঃ আল্লামা শেখ সাদী জীবনে বহু কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন, সে সকল কাব্য গ্রন্থ মানুষের নৈতিক ও চরিত্র গঠনের জন্য অমূল্য বাণী। আল্লামা সাদীর অলঙ্কারময় ভাষা ও প্রকাশের জাদু ভঙ্গি পাঠক হৃদয়কে হর হামেশা বিমোহিত করে রাখেন। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থে সকল আলেম ওলামা তথা শিক্ষিত শ্রেণীর পাঠক হৃদয় জয় করেনি বরং সকলের হৃদয়কেই বিমুগ্ধ করে। তাঁর লিখিত কাব্যগ্রন্থ কারিমা, বোস্তা, গুলিস্তা অদ্যাবধি বিভিন্ন ধনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমনকি জ্ঞানী গুণী লোকজন তাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থ কারীমা, গোলেস্তা ও বোস্তা চরিত্র গঠন মানসে শিক্ষার্থীদের গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। পীর মাশায়েখ আলেম ওলামাগণ বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলের শুরু ও মধ্যখানে উপদেশমূলক বাণী বলতে গিয়ে শেখ সাদীর কবিতা আবৃত্তি করে থাকেন। তাঁর কবিতা। উদ্ধৃতি না করে বক্তাগণ তাঁদের ওয়াজ জমাতে পারেন না। কচিকাচা শিশুরা বিভিন্ন সময় সুললিত কণ্ঠে শেখ সাদীর কারীমা গ্রন্থের কবিতা পাঠ করে থাকে।

"কারীমা ব-বখশায়ে বর হালে মা
কে হাস্তাম আসীরে কামান্দে হাওয়া। না দারমে গায়বে আযতু ফরিয়াদরা
তু-য়ী আসীয়ারা খাতা বখশও বাশ, নেগাহদার মারা যে রাহে খাতা
খাতা দার গোযারও সওস্থবম নমা।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে রাহমানুর রাহিম তুমি আমার প্রতি দয়া কর। আমি কামনা বাসনার শিকলে বন্দী। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ প্রভু নেই তাঁর নিকট আমি প্রার্থনা করব। তুমি ছাড়া আমার কেহ ক্ষমা করার মত নেই। তুমি আমার সকল পাপ হতে রক্ষা কর। আমার পাপ ক্ষমা করে সঠিক পথ প্রদর্শন কর।

ইহধাম ত্যাগ ঃ বিশ্ববিখ্যাত কবি আল্লামা শেখ সাদী ভক্তবৃন্দদেরকে কাঁদিয়ে ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দ মোতাবেক ৬৯১ হিজরীতে ১২০ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। ঐতিহাসিক শিরাজ নগরের দিলকুশা নামক স্থানে পাহাড়ের নীচে তাকে সমাধি করা হয়।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ভূমিকা ঃ গোটা বাঙ্গালী মুসলিম জাতি যখন প্রতি পদে পদে সত্য ছেড়ে মিথ্যার পথে ধাবিত হচ্ছিল, শুধু মিথ্যা নয় দূনীতির মধ্যে যখন নিজেদের ব্যক্তিত্ব জাতীয়তা ইসলামী বোধ বিলীন করে দিয়েছিল, ঠিক এমনি যুগ সন্ধিক্ষনে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ পন্ডিত্ব ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

যে সকল মনীষীর অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও লেখনীর মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে শুধু তাই নয়, যারা বাংলা ভাষা প্রীতি হৃদয়ের মণিকোঠা লালন করে মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় স্থান দেওয়ার জন্য ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভাষা আন্দোলনের পটভূমি নির্মাণে বলিষ্ঠ সংগ্রামী সৈনিকের সুমহান দায়িত্

www.pathagar.com

পালন করে ইতিহাসের পাতায় চির ভাস্কর হয়ে রয়েছেন, তাদের মধ্যে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অন্যতম। যুগবরেণ্য মনীষী বিভিন্ন ভাষা তথা বাংলা, ইংরেজী, আরবী, ফার্সী জার্মান, উর্দ্ধ, হিন্দী, তিব্বতী, পলি, সংস্কৃত, সিংহলী, মৈথিলী, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, মারাঠি, তামিল, অহমীয়া, বৈদিক, উড়িয়া, আরেস্তান প্রভৃতি ভাষাসহ সর্ব মোট ২৪টি ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন মুসলিম জাতি তথা গোটা উপমহাদেশের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

পরিচয় ঃ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার পিয়ারা নামক গ্রামের এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মফিজুদ্দিন আহমদ এবং মাতার নাম নূরুন্নেছা। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জন্মস্থান পশ্চিম বঙ্গে হলেও দেশ বিভাগের অনেক পূর্ব হতেই তিনি ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন।

শিক্ষাজীবন ঃ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ছোট বেলা হতেই জ্ঞান অর্জনের প্রতি তিনি ছিল অধির আগ্রহ। যে আগ্রহ উদ্দীপনাই তাঁকে সম্মানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়েছে । তাঁর বয়স যখন আনুমানিক ৬ বৎসর তখন হতেই তিনি গৃহ শিক্ষকের নিকট আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করতে থাকেন। ১৯০৪ সালে তিনি সংস্কৃতকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে পিতার কর্মস্থল হাওড়ার জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯০৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এফ, এ, পাশ করেন। এফ, এ, পাশ করার পর হুগলী কলেজে বি, এ, (অনার্সে) ভর্তি হন, ১৯১০ সালে হুগলী কলেজ থেকে সংস্কৃতি ভাষা বিষয়ে

www.pathagar.com

কৃতিত্বের সাথে বি, এ, (অনার্স) পাশ করেন। অনার্স পাশ করার পর তাঁর মনে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পড়ার প্রবল ইচ্ছা জাগে। কিন্তু মুসলমান হওয়ার কারনে সেকালের হিন্দু পন্ডিতগণ ষড়যন্ত্রমূলক ভাঁবে তার উচ্চ শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু জ্ঞানের প্রদীপ সত্যের সৈনিক ডঃ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ উচ্চ শিক্ষার বাসনা পূর্ণ করার মানষে ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে নিজ সাধনা ও অধ্যবসায়ের বলে সংস্কৃতের অনুশীলন করে অল্প দিনের মধ্যেই একজন উচ্চ পর্যায়ের সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ বলে সকলের কাছে পরিচিতি অর্জন করেন। ১৯১২ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভাষাতত্ত্বে কৃতিত্বের সাথে এম, এ, পাশ করেন। ১৯১৪ সালে আইন পরীক্ষায়ও কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়। ইউরোপীয় ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করার লক্ষ্যে ইউরোপে পাড়ি জর্মান। সেখানে প্যারিস বিশ্ববি লয়ে ভর্ত্তি হয়ে মাত্র দুবৎসরের মধ্যে প্রাচীন পারসিক ভাষা, বৌদক, বৌদ্ধ, তিব্বতী, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব সংস্কৃতে পন্ডত্য অর্জন করেন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম শ্রেণীর ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্মজীনব ঃ উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শিক্ষা জীবন শেষ করে সর্বপ্রথম ১৯১৪ সালে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন। সেখানে কিছুদিন চাকুরী করার পর মনস্থির না হওয়ায় চাকুরী ছেড়ে নিজ দেশে বসিরহাটে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। কিন্তু ইসলামী রেনেসার অগ্রনায়ক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দেখলেন, আঁইন ব্যবসায় সত্যের বিরোধিতা ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে হয় তাই ৪ বৎসর পরই এ ব্যবসা ছেড়ে দেন। আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ১৯১৯ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা সহকারী

www.pathagar.com

হিসাবে দায়িত্ব নেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বাংলাভাষার অধ্যাপক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগেও খন্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত দুটি পৃথক বিভাগে পরিণত হলে বাংলা ভাষার বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করার পর বগুড়ার আজিজুল হক কলেজের ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের বিশেষ অনুরোধে অধ্যক্ষ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপরে ১৯৪৮ সালে পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান এবং কলা বিভাগের ডীন নিযুক্ত হন।

১৯৫৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠত হয় ১৯৫৫ সালে সর্বপ্রথম কলা অনুষদ চালু করা হয়। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মেধা ও যোগ্যতার পরিচয়ে কলা অনুষদের প্রধান নিযুক্ত হন। একাধারে তিন বৎসর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী করেন। জীবনের শেষ প্রান্তে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। তিনি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক থাকাকালীন আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তার সময়েই বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থাবলী সবচেয়ে বেশী অনুদিত হয়। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বহু চেষ্টা করেন, চেষ্টাই নয়, বাংলাভাষার প্রশ্নে আপোসহীন আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন। বৃটিশ ভারতে যখন ভাষার প্রশ্নে তুমুল বাগবিতন্তা চলছিল, বাংলা না ইংরেজী, উর্দু না হিন্দী এমনি বহু প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিজীবী মহলে, এমনি সময়ে ১৯১৭ সালে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে জোরালো কণ্ঠে

www.pathagar.com

তিনি সকলের সামনে বলেছিলেন, বন্ধুগণ! আমাদের কথাবার্তা, আচার আচারণের স্নেহ ভালবাসা, ধ্যান ধারণা প্রকাশের বাহন বাংলা ভাষা। বিধায় আমাদের মাতৃভাষা হবে বাংলা। যাই হোক, তিনি মাতৃভাষা বাংলার যথার্থ গুরুত্ব সকলকে বুঝাতে লাগলেন। ১৯১৯ সালে শান্তি নিকেতনে এক সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সভাপতির ভাষণে হিন্দীকে ভারতের সাধারণ ভাষা হিসেবে গ্রহণের সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর এ বক্তব্যের কঠোর বিরোধিতা করেছিলেন উপমহাদেশের সর্বশেষ্ঠ ভাষাবিদ ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রনায়ক মুসলিম ব্যক্তিত্ব ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, তিনি উক্ত সভায় ভারতের একটি সাধারণ ভ্যাষা শীর্ষক হৃদয়গ্রাহী সারগর্ভ একটি প্রবন্ধ পেশ করেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বাংলাভাষাকে ভারতের সাধারণ ভাষা হিসেবে মেনে নেয়ার সপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ পেশ করে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের পটভূমি নির্মানে এক বিপ্লবী সৈনিকের মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মাতৃভাষাও ছিল বাংলা, যার কারণে তিনি বাংলার স্বপক্ষে জ্ঞানীগুণীদের আসরে কেবল যুক্তি দিয়েই আলোচনা করেননি; বরং তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি উপস্থাপন করে মাতৃভাষা বাংলার গুরুত্ব শ্রেষ্ঠত্ব সুন্দর ভাবে প্রমাণ করেছেন। বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার বহু আন্দোলন ও প্রচেষ্টার পর ১৯৫১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রী নূরুল আমীনের কাছে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবীতে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সেই স্মারকলিপিতে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাও স্বাক্ষর করেন। শুধু স্বাক্ষর নয়, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে স্মারকলিপি পেশ করার সময়ও হাজির হন। ১৯৫১ সালের ১৬ই মার্চ কুমিল্লায় পূর্ব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ অধ্যাপক মহাসম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ভাষা সৈনিক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সুন্দর বক্তব্য

www.pathagar.com

উপস্থাপন করে বজ্র কণ্ঠে উপস্থিত সকলের সামনে ঘোষণা দেন, মাতৃভাষা বাংলা কোন ভাবে অবহেলিত হলে আমি শহীদুল্লাহ সর্বপ্রথম বিদ্রোহ করব, এহেন হৃদয়গ্রাহী কথা ...র সাথে সাথে উপস্থিত সকলেই সমস্বরে বলে উঠলো আমরা আপনার সাথে আছি এবং ভাষা আন্দোলনে থাকব। সকলের একান্ত প্রচেষ্টায় ও আন্দোলনের মুখে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয়।

মিষ্টভাষী সদালাপী সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লা রফিক, বরকত জব্বার প্রমুখের আন্দোলনে জীবন উৎসর্গের সংবাদ পেয়ে শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তিনি এতদূর ব্যথিত হয়েছেন যার কারণে নিজের পরিধেয় কালো শেরোয়ানী কেটে ব্যাজ তৈরী করে বুকে ধারণ করেন।

গবেষণামূলক গ্রন্থ ঃ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর সারাট জীবন কাটিয়েছেন জ্ঞান সাধনা ও ভাষা গবেষণার কাজে। তিনি জীবনে সময়ের মূল্য দিতেন, তিনি জানতেন সল্প পরিসর জীবনে অজস্র গবেষণা করে প্রয়োজনীয় লেখাপড়া চালিয়ে দায়িত্ব কর্তব্য যথাসময়ে শেষ করতে হবে। যার কারণে তিনি কোন সময়ই অলস হয়ে বসে থাকতেন না। তিনি সর্বদা তাঁর গবেষণা করে প্রয়োজনীয় লেখাপড়া চালিয়ে যেতেন। তাঁর মূল্যবান গবেষণামূলক গ্রন্থগুলির মধ্যে বাংলা সাহিত্যের কথা, পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, বাংলাভাষার ইতিবৃত্ত, পদ্মাবর্তী, বিদ্যাপতি শতক, বাংলা ব্যাকরণ, ভাষা ও সাহিত্য, আমাদের সমস্যা, প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি রুবাইয়া, ওমর খৈয়াম, দেওয়ান-ই হাফিজ, ইকবালের শেকওয়া, এবং জওয়াবই শিকওয়ার বঙ্গানুবাদ করেছেন। তাঁর লিখিত বইয়ের সর্বমোট সংখ্যা ২৮৫টি এছাড়া তাঁর

www.pathagar.com

লিখা অনেক কবিতা ও গল্প রয়েছে তিনি ১৯২০ সালে অঙ্কুর নামে একটি সাহিত্য পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন।

ইহধাম ত্যাগ ঃ এ মায়াময় পৃথিবীতে কেউ চিরদিন থাকতে পারবেনা। সকলেরই মৃত্যুর অমিয় সুধা পান করতে হবে। ধনী, সফর রাজা বাদশাহ কেউ মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পায়নি। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সুদীর্ঘ আড়াই বছর অসুস্থ থাকার পর ১৯৬৯ সালের ১৩ই জুলাই রোজ রবিবার ৮৪ বৎসর বয়সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁকে দাফন করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বরের দক্ষিণ দিকে রাস্তার পূর্ব পাশে কার্জন হল সংলগ্ন পশ্চিম পাশে।

আল-বেরুনী

জন্ম ঃ মুসলিম ইতিহাসে বিখ্যাত মহাবিজ্ঞানী আল- বেরুনী ৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম আবু রায়হান মুহাম্মদ ইবনে আহ্মদ আল-বেরুনী। আল-বেরুনীর ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তাঁর সংসার জীবন, তাঁর সন্তানাদি ছিল কিনা বা আদৌ বিবাহই করেছিলেন কিনা তার কিছুই জানা যায় না। অথচ নিদ্রা ব্যতীত তাঁর চোখ বই-এর পাতা ছাড়া কখনো অন্যত্র থাকতো না।

www.pathagar.com

বিভিন্ন বিষয়ে পান্ডিত্য লাভ ঃ আল-বেরুনী ছিলেন জ্ঞানের এক মহাসাগর। প্রফেসর মাপাও বলেন,"আল-বেরুনী ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি।" গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র পুরাতত্ত্ব, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, সভ্যতার ইতিহাস, দিনপঞ্জির তালিকা ও ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, ভূগোল, প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ছিলেন অসাধারণ মনীষী ও পন্ডিত ব্যক্তি।

তিনি একাধারে আরবী, ফার্সী, গ্রীক, হিব্রু, সিরীয়, সংস্কৃতি প্রভৃতি ভাষার সুপন্ডিত। এ সমস্ত ভাষায় তাঁর লেখা, গবেষণা ও বক্তব্য আজও পান্ডিত্যের সেরা নিদর্শন। আল-বেরুনী আব্বাসীয় খলীফা মামুন বিন মাহমুদের দরবারের অন্যতম সভ্য হিসেবে খাওয়ারিজমে অবস্থান করেন। আব্বাসীয় খলিফা আব্দুল্লাহ নিহত হলে রাজনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। আল-বেরুনী এ বিপর্যয় দেখে জন্মভূমি ত্যাগ করে জুরজানে চলে যান। নিঃস্ব নিঃসহায় অবস্থায় যখন জুরজানের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২২ বৎসর। অভাব অভিযোগের কারণে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি গণ্যমান্য মানুষেরা যে অপমানজনক ব্যবহার করতেন এতে মর্মাহত হয়ে তিনি মানুষের দারিদ্র্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন 'দরিদ্র মানুষের গুণকে দোষে পরিণত করে।'

এ থেকে বুঝা যায় এ সময় তিনি চরম অর্থকষ্টে ছিলেন। অথচ তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় কোন প্রকার ঘাটতি তো হয়ই নি, বরং তখনই তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুখ্যাতি চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এ সুখ্যাতির কারণে খলীফা মামুন তাঁকে দেশে ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানালে তিনি রাজকীয় আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং খলীফা মামুনের প্রধানমন্ত্রীরূপে কাজ করেন এবং

www.pathagar.com

বাগদাদে তিনি একটি মানমন্দির স্থাপন করেন। এভাবে ৭ বছর অতিবাহিত হবার পর সুলতান মাহমুদের প্রস্তাবে ১০১৬ খৃষ্টাব্দে গজনীতে চলে আসেন। সুলতান মাহমুদের দরবারে ১০১৬ থেকে ১০১৯ পর্যন্ত ছিলেন। এরপর রাজ সমর্থন নিয়ে ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১০ বছর ভারতে অবস্থান করেন। এরপর তিনি আবার গজনিতে ফিরে আসেন এবং কিছুদিন পর সুলতান মাহমুদ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র মাসউদ সিংহাসন আরোহণ করেন। আল্-বেরুনী যেমনি শাসক কাবুসের নামে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আসারুল বাকিয়া' উৎসর্গ করেন, তেমনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সুলতান মাসউদের নামে উৎসর্গ করেন। যার নাম দেয়া হয়েছিল 'কানুনে মাসউদী'।

শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলী ঃ আল-বেরুনী সর্বমোট ১১৪টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর মধ্যে 'কানুনে মাসউদী' শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হয়। 'কানুনে মাসউদী' ১১ খন্ডে সমাপ্ত করা হয়েছে। এসব খন্ডের মধ্যে কোন কোন খন্ড বিক্ষিপ্ত ভাবে অনুদিত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থটি অনূদিত না হওয়ায় তাঁর জ্ঞান গ্রহ থেকে পৃথিবী এখনো বঞ্চিত। এ গ্রন্থটিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ত্রিকোণমিতি, গ্রহ, দ্রাঘিমা, চন্দ্র, সূর্যের মাপ, নক্ষত্র ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য বই 'কিতাবুত তাফহীম', কিতাবুল হিন্দ, আসারুল বাকিয়া, ইফরাদু কাল ফি আমরিল আযাল' ইত্যাদি।

জ্ঞান তিনি এত ভালোবাসতেন যে, তাঁর কৃত গ্রন্থগুলোকে সন্তানের মত ভালবাসতেন। জীবনের মূল্যবান সময় কেবল জ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন।

www.pathagar.com

আল-বেরুনী বহু জ্ঞান-বিজ্ঞান, বহু সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস, আকাশতত্ত্ব, মৃত্তিকাতত্ত্ব, সাগরতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে মানব জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

ইন্তেকাল ঃ আল-বেরুনী ১০৪৮ খৃষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর শুক্রবার ইন্তেকাল করেন। তিনি ৭৫ বছর জীবন পেয়ে ছিলেন।

সম্রাট শাহজাহান

১৬২৭ খৃষ্টাব্দ হতে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল। তখন বুন্দেলখণ্ডের আফগান সর্দার খানজাহান লোদী বিদ্রোহী হলে সম্রাট তাঁকে দমন করেন। তারপর ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে আহমদনগর দখল করেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের তিনি শান্তিপূর্ণভাবে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করবার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু তাঁরা যুদ্ধই পছন্দ করলেন। তখন সম্রাট একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। অবস্থা অশুভ বুঝে বিজাপুরের সুলতান বাৎসরিক ২০ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সন্ধি করলেন। এমনিভাবে ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের আদিলশাহী ও গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী সুলতানদ্বয়ের সঙ্গে সন্ধি করে শাহজাহান নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। ঐ সময় বঙ্গদেশে পর্তুগীজরা ঘাঁটি তৈরি করে বাণিজ্য ও অত্যাচারের বেশ উন্নতি করেছিল। তখন বাংলার সুবেদার ছিলেন কাসিম আলী খাঁন। সম্রাট শাহজাহান তাঁকে আদেশ দিলেন হুগলী অবরোধ করে পর্তুগীজদের যেন উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্রাটের

www.pathagar.com

আদেশে যুদ্ধ ঘোষিত হল। পুর্তুগীজরা পরাজিত ও বহু নিহত হয় এবং অজস্র পর্তুগীজ বন্দী হয়ে আগ্রায় প্রেরিত হয়।

শাহজাহানের চেহারা পোশাক-পরিচ্ছদ একজন পূর্ণ মুসলমানের মতই ছিল এবং জাহাঙ্গীরের ধর্মীয় ভাবান্তর ও ইসলামে আত্মসমর্পণের ছাপ শাহজাহানের উপরও পড়েছিল। সম্রাটের স্ত্রীর নাম ছিল মমতাজ, মমতাজের মৃত্যু হ.ন ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে।

এ ব্যাপারে আমাদের জেনে রাখা দরকার যে, মমতাজের মৃত্যুজনিত শোকে শাহজাহানের মস্তিক বিকৃতি দেখা দিয়েছিল। এবং মমতাজের মৃত্যুর পর তিনি শুধু শোকে নয়, নানা শারীরিক ও মানসিক পীড়ায়ও পীড়িত ছিলেন। তাই দূরবর্তী শ্রেষ্ঠতম শাহজাদা আলমগীরের মূল্য নির্ধারণ করতে না পেরে নিকটবর্তী অপদার্থ দারাশিকোকেই আশাতিরিক্ত স্নেহ ও সুযোগ সিক্ত করে তাঁকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর লালকেল্লা, দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়া-ইআম, মোতি মসজিদ, দিল্লীর জুমআ মসজিদ, ময়ুর সিংহাসন প্রভৃতি শাহজাহানের অক্ষয় কীর্তি, যার সঙ্গে তাঁর স্থাপত্য শিল্পপ্রীতি ও ধর্মানুরাগী মনেরও পরিচয় বিজড়িত।

একবার শাহজাহান রাত্রির স্বপ্নে একটি মসজিদ দর্শন করলেন। ঘুম ভাঙ্গার পর তাঁর স্থপতিদের ডাকলেন এবং আদেশ দিলেন, 'আমার বর্ণনা অনুযায়ী আপনারা ঐ মসজিদের ছবি এঁকে আমায় দেখান।' সকলেই বহুরূপে বহুভাবে কল্পিত মসজিদের একটা করে ছবি আঁকলেন বটে, কিন্তু একটি ছবিও বাদশাহের মনের মত হোল না। সেই সময় মস্ত বড় এক সাধক বা দরবেশ খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। অবশেষে তাঁরই শরণাপন্ন হতে হয় বাদশাহকে ঐ ছবির জন্য। দরবেশ বাদাশাহকে জানালেন, 'আমার অপেক্ষাও বড় দরবেশ

www.pathagar.com

যিনি আপনার রান্না করেন।' বাদশাহ অবাক হয়ে দাড়িওয়ালা ছোট জামা পরা রাঁধুনিকে ডেকে ছবির কথা বলতেই তিনি বললেন, 'আমার চেয়েও বড় বুজুর্গ যিনি আপনার পায়খানা পরিষ্কার করেন।' বাদশাহ অবাক হয়ে মেথরকে ডেকে বললেন, আপনার মত মহান মানুষে নিজেকে গোপন রাখার এই কৃচ্ছ্র সাধনার উপর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আর ক্ষমা চাইছি আপনাকে এর আগে চিনতে না পারার জন্য'। মেথর ফকির তাঁর স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে বললেন, 'উহা ইঞ্জিনিয়াররা আঁকিতে পারিবে কেন? উহা যে বেহেস্তের মসজিদ'। মেথর ফকির একজন শিল্পীকে ডেকে আনালেন এবং নিজে একটি মসজিদের ছবি এঁকে তাঁকে দেখালেন। বাদশাহ্ খুব অবাক হলেন যে, এ ছবি তাঁর স্বপ্নে দেখা ছবির সাথে হুবহু সংগতিপূর্ণ। ফকির শেষ কথা বললেন, 'ভ্রতাঃ স্মরণ থাকে, যে ব্যক্তির কখনও নামায কাজা হয় নাই কেবল তিনিই এই মসজিদের প্রথম ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিবেন'। আরও কথিত আছে, ঐ ঘটনার পরের দিন হতে সেই ফকিরকে আর লোকালয়ে দেখা যায়নি।

প্রথম দিল্লির জুমআ মসজিদ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনায় সম্রাট বহু আলেম, সুফী, আমির-ওমরাহদের বললেন, 'আমি লোক দ্বারা মসজিদের প্রথম ইট বসাতে চাই যাঁর বারো বছর কোন দিন তাহাজ্জুদের নামাজ কাজা হয়নি।' প্রতিদিন গভীর রাত্রে নিয়মিতভাবে ঐ নামাজ পড়া কঠিন কাজ; তাই নানা কারণে কেউ এগিয়ে আসলেন না। বাধ্য হয়ে বাদশাহ নিজেই প্রথম ইট বসালেন এবং কেঁদে ফেললেন 'হে আল্লাহ আমি জানতাম না যে তুমি আমাকে এমনিভাবে প্রকাশ করে লজ্জিত করবে। হে আল্লাহ তোমার শোকর যে আমার বারো বছর তাহাজ্জুদ বাদ যায়নি।' অনেকে প্রশ্ন করলেন, বাদশাহ দিল্লির শাহী মসজিদ এত উঁচু জায়গায় নির্মাণ করছেন কেন? উত্তরে

www.pathagar.com

সম্রাট বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর আমার ছোট-বড় প্রজারা যখন উচ্চ স্থানে স্থাপিত মসজিদে খোদাকে সেজদা করবেন আমি তখন আমার প্রজাবৃন্দের পায়ের নীচে, অনেক নীচে কবরে তাঁদের দোওয়ার ভিক্ষুক হয়ে প্রতীক্ষায় থাকবো।' দিল্লির বুকে আজও সেই মসজিদ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

আজ আমাদের সূক্ষ্ম বিচারদণ্ড ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণা করে দেখতে হবে যে, সারা ভারতের সর্বাধিনায়ক যে সম্রাট শাহজাহান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মমতাজকে কাছে বা পাশে পেয়েও আল্লার স্মরণে তাঁর সমস্ত আকর্ষন উপেক্ষা করেও তাহাজ্জুদের নামাজে মগ্ন হতে পারেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে উচ্ছৃঙ্খল, না উচ্ছৃঙ্খল তারাই যারা তাঁর চরিত্রের উপর মিথ্যা কলঙ্কের কালিমা লেপন করতে দ্বিধা করেন নি?

শাহজাহানের শাসনকালে দু-একটি বিদ্রোহ ছাড়া শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় নি।

"শাহজাহান তাঁহার পিতা অপেক্ষা রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনায় অধিক সর্তক ও যত্নবান ছিলেন' ফরাসি ঐতিহাসিক ও পর্যটক তাভার্নিয়ের যা বলেছেন তাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "শাহজাহান রাজা হিসাবে প্রজাদের শুধু শাসন করা নয়, পরিবার এবং সন্তানদের পিতার ন্যায় তিনি প্রজা শাসন করিতেন।

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত ইসলামী বই সমূহ

- নামাযের মৌলিক শিক্ষা
- সূরা কাউছারের মৌলিক শিক্ষা
- নূরানী নামায শিক্ষা (পকেট)
- বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুসলিম মণীষীদের কথা
- মহানবীর (সঃ) শ্রেষ্ঠ বাণী সংকলন
- ছোটদের প্রিয় নবী
- ছোটদের খোলাফায়ে রাশেদীন
- ইসলামী নামের সংকলন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com